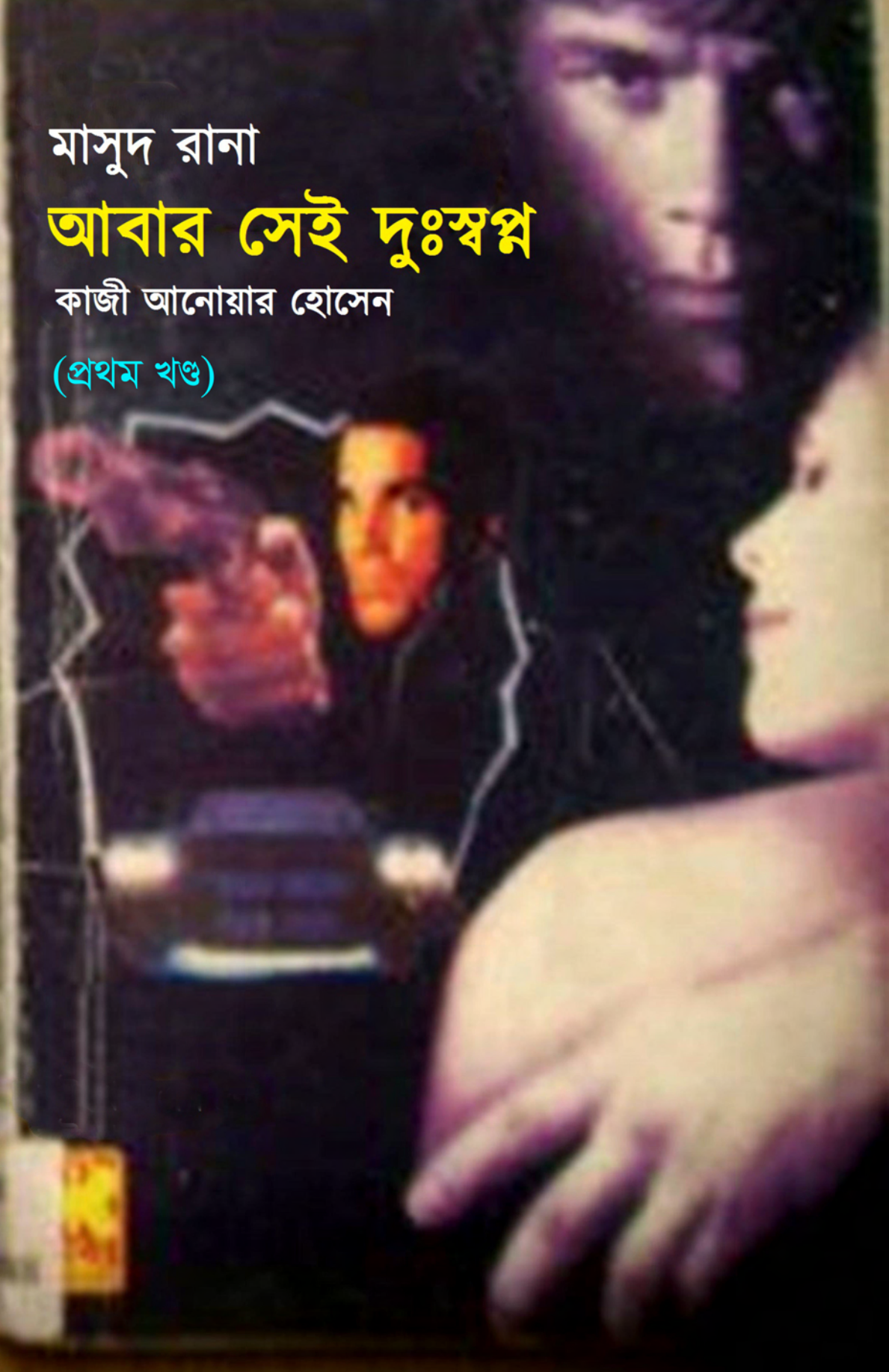
মাসুদ রানা

আবার সেই দুঃস্বপ্ন

কাজী আনোয়ার হোসেন

(প্রথম খণ্ড)



আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১

এক

বিস্তীর্ণ পতিতভূমির দূর কোনো প্রান্তে মেশিনগান গর্জে উঠলো। অকস্মাৎ এবং ভীতিকর; বিকেলের গরম রোদ, আর থমকে থাকা বাতাসের ভেতর কেমন ভোঁতা শোনালো আওয়াজটা। নিচে, খোলা পাথরখাদের ভেতর, নিস্তব্ধতা নামলো, স্থির হয়ে গেল কয়েদীদের হাত। খালি গা, ঘামে চকচক করছে, চোখে আগ্রহ আর প্রশ্ন নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকালো ওরা।

খাদের উত্তর পাঁচিল ঘেঁষে, ছায়ায় দাঁড়িয়ে কাজ করছে রিড কোয়েন। তার চারপাশে প্রকাণ্ড সব স্লেট পাথর। দশ পাউণ্ড ওজনের হাতুড়িটা মাথার ওপর তুলে একটা পাথরের চিড়ে আটকানো ক্রো-বারের ওপর লক্ষ্য স্থির করলো সে, ঠিক তখুনি তার কানে ঢুকলো আওয়াজটা। ধীরে ধীরে মাথার ওপর থেকে হাতুড়িটা নামালো, চোখ চলে গেল দূর পাহাড়ের দিকে, কপালে একটা হাত তুলে আলো ঠেকালো।

লোকটা ছোটোখাটো, কিন্তু শক্তসমর্থ। বয়স হবে আঠাশ

কি ত্রিশ। শরীরের তুলনায় কাঁধ দুটো একটু বেশি চওড়া, মোটাসোটা হাতে পাকানো রশির মতো পেশী। মাথার চুল ঠিক কালো নয়, লালচে কালো, জুলফির কাছে অকালে সাদা হয়ে গেছে কয়েক গাছি। চোখ জোড়া তার চারপাশের ধূসর পাথরের মতোই ঠাণ্ডা আর কঠিন। চেহারায় এই মুহূর্তে চাপা উত্তেজনার একটা ভাব রয়েছে। লাঞ্চের পর থেকে বিরতিহীন পাথর ভাঙছে সে। তার সঙ্গী, বাচ, একজন আইরিশ, চেহারায় গোঁয়ার-গোবিন্দ ভাব; দু'হাতে ধরা ক্রো-বারটা পাথরের চিড় থেকে অনায়াস ভঙ্গিতে বের করে নিলো, ধীরে ধীরে সিধে হলো। ঘাম চকচকে কপালে খাড়া রেখা ফুটলো তিনটে।

'ও কিসের আওয়াজ? কোত্থেকে এলো?'

'যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা,' বললো কোয়েন। 'ফিল্ড আর্টিলারি।'

সঙ্গীর দিকে হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকালো বাচ। 'ঠাট্টা করছো?'

'গ্রীষ্মকালীন মহড়া—রুটিন। মহড়ার আয়োজন যদি দেখতে! ফি বছর এই সময়টায় সাজ সাজ রব পড়ে যায় আর্মিতে।'

দূরে, পাহাড়-চূড়া ছুঁইছুঁই করে উড়ে গেল তিনটে ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন। কি যেন বলতে যাচ্ছিলো বাচ, কিন্তু প্লেনগুলোর পেট থেকে সাদা মতো কি যেন ছিটকে বেরিয়ে আসতে দেখে তাজ্জব বনে গেল সে। প্রথমে মনে হলো পোঁটলা বা বস্তা হবে। তারপর ওগুলোর আকৃতি বদলালো। খুলে গেল প্যারাস্যুট, প্রত্যেকটার সাথে একজন করে সৈনিক। বিকেলের থমকানো বাতাসে ফুলে-ফেঁপে উঠলো প্যারাস্যুট, রোদ লেগে ঝলসে উঠলো সাদা সিল্ক। নীল আকাশে, শূন্যে, ভাসছে লোকগুলো। স্বাধীন

আর মুক্ত ওরা। খাঁচায় বন্দী পাখির মতো করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো কয়েদীরা। স্বাধীনতা কি জিনিস, মুক্তি কাকে বলে, ওদের চোখে যেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো প্যারাট্রুপাররা। হঠাৎ তলপেটে একটা শূন্যতা অনুভব করলো বাচ, জোরালো একটা ঝাঁকির সাথে ক্রো-বারের হাতলটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরলো সে।

এদিক ওদিক মাথা নাড়লো কোয়েন। ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ একটু তীক্ত হাসি। 'উপায় নেই, হে, উপায় নেই। পাঁচ মাইলও যেতে পারবে না।'

ক্রো-বারটা ছেড়ে দিলো বাচ। ঠকাস করে পাথরের ওপর পড়লো সেটা। তার ঠোঁট জোড়া কাঁপছে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো। 'জানি,' নিচু গলায় বললো। 'তবু মন মানে না!'

'প্রথম পাঁচ বছর সত্যি কঠিন—স্রেফ নরকযন্ত্রণা,' বললো কোয়েন, নির্লিপ্ত চেহারা। বাচের দিকে তাকাচ্ছে না।

'আমার তো মনে হয়···,' থেমে গেল বাচ, পিছনে আলগা পাথরে পায়ের আওয়াজ। কাঁধের ওপর দিয়ে দ্রুত একবার পিছনটা দেখে নিলো সে। ক্রো-বারটা তোলার জন্যে ঝুঁকলো, ফিসফিস করে ছোট্ট একটা শব্দ উচ্চারণ করলো, 'সিলভার।'

বাচ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেও, কোয়েনের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। পাহাড়ের আড়ালে এক এক করে হারিয়ে যাচ্ছে প্যারা-ট্রুপাররা, সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো সে। মনে মনে হিসেব করলো, প্রায় চার মাইল দূরে নামছে ওরা। পায়ের

আওয়াজ ঠিক তার পিছনে থামলো।

দাপট দেখানো যাদের নেশা, প্রিজন অফিসার মাইক সিলভার তাদের একজন। সুদর্শন, দীর্ঘদেহী তরুণ, অল্প কিছুদিন হলো অফিসার হয়েছে। তার মুখে থমথমে গাম্ভীর্য, আর চোখে কঠিন দৃষ্টি, অল্প বয়েসী চেহারায় দুটোই বেমানান। এই গরমেও পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরে আছে সে। কড়া মাড় দেয়া খাকি শার্টের সামনে আর দু'পাশে নানা আকৃতির ব্যাজ আর ফিতে, সামরিক একটা ভাব এনে দিয়েছে। একই রঙের ট্রাউজার আর ক্যাপ, ক্যাপটা একটু তেরছা করে পরেছে, প্রায় ঢাকা পড়ে আছে চোখ দুটো।

ওদের থেকে এক গজ দূরে থামলো সে। চকচকে রুলারটা কোনো কারণ ছাড়াই ঘন ঘন হাতবদল করছে, যেন যে-কোনো মুহূর্তে ধাঁই করে কারো পিঠে বসিয়ে দেবে। 'অ্যাই, বদমাশ! হচ্ছেটা কি শুনি!' গা জ্বালানো কর্কশ কণ্ঠস্বর, মুখ-ভঙ্গি দেখে মনে হবে ভেংচাচ্ছে। 'বাপের টাকায় পিকনিক করতে এসেছো, অ্যাঁ? কাজ ফেলে তামাশা দেখা হচ্ছে!'

যেমন ছিলো তেমনি দাঁড়িয়ে থাকলো কোয়েন, পিছন ফিরে তাকানো তো দূরের কথা এক চুল নড়লো না পর্যন্ত। আচমকা পাথর খাদের ভেতর জমাট নিস্তব্ধতা নেমে এলো, সবাই যে যার কাজ থামিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। কোয়েনের ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল, সিলভার সেটা দেখতে পেলো না।

'শালা দেখছি তবু নড়ে না!' রাগে পাথরের ওপর পা ঠুকলো

সিলভার, রুলারটা বাগিয়ে ধরলো শক্ত করে। 'অ্যাই, কোয়েন, কানে পানি ঢুকেছে, নাকি দু'এক ঘা লাগবে?'

কথা বললো না, তবে নড়ে উঠলো কোয়েন। থো থো করে হাতের তালুতে থুথু ছিটালো সে, এক ঝটকায় মাথার ওপর তুললো হাতুড়ি, তারপর অব্যর্থ লক্ষ্যে ক্রো-বারের ওপর নামালো সেটা। স্লেট পাথরের বড়সড় টুকরোটা নিখুঁতভাবে দু'ভাগ হয়ে গেল। 'মন্দনয়, কি বলো, বাচ?' সহাস্যে জিজ্ঞেস করলো সে। 'এসো, আরেকটা ভাঙি।' ভুলেও সে প্রিজন অফিসার সিলভারের দিকে তাকালো না, লোকটার যেন কোনো অস্তিত্বই নেই।

আরো কয়েক সেকেণ্ড স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো সিলভার, রাগে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো। তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে গট গট করে চলে গেল সে।

'তোমার কিন্তু সাবধান থাকা উচিত, কোয়েন,' নিচু গলায় বললো বাচ। 'ও শালা এক নম্বর হাড়ে-বজ্জাত। সুযোগ পেলে ও তোমাকে ছাড়বে না।'

হাসতে হাসতে কোয়েন বললো, 'সেই সুযোগটাই ওকে আমি দিতে চাই।' বাচের চেহারায় বিস্ময় এবং অবিশ্বাস ফুটে উঠতে দেখলো সে, কিন্তু প্রসঙ্গটা নিয়ে আর কোনো কথা বললো না। মাথার ওপর আবার হাতুড়িটা তুললো, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে নামিয়ে আনলো ক্রো-বারের ওপর। অব্যর্থ লক্ষ্য, সমান দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল স্লেট পাথর।

পাথরখাদ থেকে উঠে আসা রাস্তার মাথায় একটা ল্যাণ্ড-রোভারের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন প্রিন্সিপাল অফিসার ওয়েন ফোরসাইথ। দু'আঙুলের ফাঁকে জলন্ত সিগারেট, পায়ের কাছে বসে আছে কালো একটা অ্যালসেশিয়ান। লম্বা এবং মোটা মানুষ, অবসর পাবার সময় ঘনিয়ে এলেও প্রাণ-চাঞ্চল্যে এতোটুকু ভাটা পড়েনি। জেল বিভাগে ত্রিশ বছর চাকরি করলেও প্রকৃতির দান কোমল ভাবটুকু আজও চেহারা থেকে সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। কয়েদীদের সাথে ভালো ব্যবহার করেন বলে তাঁর সুনাম আছে, কিন্তু আইন-শৃংখলা রক্ষার প্রয়োজনে নির্মম হতেও জানেন তিনি। গায়ের রঙ রোদে পোড়া তামাটে, চোখে গভীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি। মানব চরিত্র সম্পর্কে গভীর আগ্রহ রয়েছে তাঁর, প্রায় প্রত্যেককেই তিনি খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেন।

সিগারেটে টান দিতে যাচ্ছিলেন, পাথরখাদ থেকে সিলভারকে উঠে আসতে দেখে হাতটা মুখের কাছে থেমে গেল। প্রিজন অফিসারের কাঁধ দুটো উঁচু হয়ে আছে, প্রচণ্ড রাগে ফুলে আছে মুখ। সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ফোরসাইথ। তিনি জানেন, কিছু লোক নিজেরাই নিজেদের বেঁচে থাকাটা যন্ত্রণাময় করে তোলে, সিলভার সম্ভবত তাদেরই একজন।

সিলভার কাছে আসতে তিনি জানতে চাইলেন, 'আবার কি হলো?'

'কোয়েন!' বাঁ হাতের তালুতে ঠাস করে রুলারের বাড়ি মারলো সিলভার। 'বজ্জাতটা শুধু শুধু আমাকে উত্তেজিত করছে!'

'কি রকম?'

'গার্ডস রেজিমেন্টে এ-ধরনের ব্যবহারকে আমরা মৌন অবহেলা বলতাম।'

প্রিন্সিপাল অফিসার নির্লিপ্ত। বললেন, 'ওটা তো একটা আমি চার্জ—এখানে খাটবে না।'

'খাটবে যে না সে আমিও জানি!' ল্যাণ্ড-রোভারের বনেটে হেলান দিলো সিলভার। তার বাঁ কপালের একটা রগ তিড়িক তিড়িক করে বার কয়েক লাফালো। 'কিন্তু এই বেয়াদবির শাস্তি যা হোক একটা কিছু থাকা দরকার। ডাকি, শোনে না। হুকুম করি, নড়ে না। অথচ সবাই ওকে এমন খাতির করে, আকাশ থেকে যেন অবতার নেমে এসেছেন। লাই পেয়ে মাথায় চড়ে গেছে লোকটা।'

'সে কথা যদি বলো, লোকে তাকে খাতির করবে না কেন?' প্রশ্ন করলেন ফোরসাইথ। 'কোয়েনই একমাত্র কয়েদী, কাজে কখনো ফাঁকি দেয় না। ভয়ানক রাগী মানুষ, কিন্তু কেউ না চটালে তার মতো মাটির মানুষ তুমি আর পাবে না। লোকটার ব্যক্তিত্ব আছে। শুধু কয়েদীরা নয়, সেপাইরা পর্যন্ত তাকে সমীহ করে—নিশ্চয় তার কারণ আছে।'

'কুখ্যাত একজন কয়েদী, তাকে সমীহ করতে হবে কেন? যার যা খুশি ভাবতে পারে, আমার দৃষ্টিতে সস্তাদরের গুণ্ডা ছাড়া কিছু নয় সে।'

'সস্তাদরের?' প্রিন্সিপাল অফিসার মৃদু শব্দে হাসলেন। 'কথাটা ঠিক বললে না। কতো টাকা ডাকাতি করেছিল, ভুলে গেছো? বিশ লাখ পাউণ্ড। একটা ডলারও উদ্ধার করা যায়নি।

আর যাই বলো, ওর দর কম ধরো না।'

'আপনারা শুধু অংকটাকেই বড় করে দেখেন,' ঝাঁঝের সাথে বললো সিলভার। 'বিশ লাখ পাউণ্ড, তাই না? তা, বিশ লাখ পাউণ্ড কোথায় নিয়ে এলো তাকে? পাঁচ বছর চোদ্দ শিকের ভেতর কাটিয়েছে, আরো পনেরো বছর কাটাতে হবে। সস্তা-দরের লোক বলেই তো এই হাল।'

'বেচারা কোয়েন!' নিঃশব্দে হাসলেন ফোরসাইথ। 'একটা মেয়েকে বড় বেশি বিশ্বাস করেছিল ও। ওটা বাদ দিলে, গোটা কাজটায় আর কোনো খুঁত ছিলো না। ডাকাতি করার সময় তো ধরা পড়েইনি, টাকাগুলো নিরাপদ জায়গায় সরাতেও পেরে-ছিল। মেয়েটা শুধু ওদেরকে ধরিয়ে দিতে পারে, কিন্তু টাকার সন্ধান দিতে পারেনি।'

প্রচণ্ড রাগে বিস্ফোরিত হলো সিলভার। 'এবার আপনিও তার প্রশংসা শুরু করছেন, ফর গডস সেক!'

ফোরসাইথের মুখের হাসি দপ্ করে নিভে গেল। তাঁর চেহারা কঠোর হয়ে উঠলো। কঠিন সুরে তিনি বললেন, 'তুমি ভুল করছো, সিলভার। কোয়েনের আমি প্রশংসা করছি না। তবে ওকে আমি বোঝার চেষ্টা করি, কারণ সেটা আমার দায়িত্বের একটা অংশ—তোমারও। কিন্তু তুমি ব্যাপারটা মনে রাখো না।' তরুণ প্রিজন অফিসার কিছু বলতে চেষ্টা করলেও, ফোরসাইথ একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন। 'তিনটে বাজে। এখন চা। ওদের তুমি ডাকতে পারো, প্লিজ, মিঃ সিল-ভার।' কথাগুলো বলে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, কয়েক পা

এগোলেন, তাঁর ছায়াকে অনুসরণ করলো অ্যালসেশিয়ানটা।

তাঁর পিঠের দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকলো সিলভার। নিঃশ্বাস ফেলতেও যেন ভুলে গেছে সে। দু'এক মুহূর্ত পর অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিতে পারলো, পকেট থেকে হুইসেল বের করে লম্বা একটা ফুঁ দিলো, তীক্ষ্ণ শব্দে বেজে উঠলো বাঁশি।

পাথরখাদের ভেতর হাতুড়িটা ফেলে দিলো কোয়েন। সিধে হলো বাচ।

'সময়ের আগে নয়,' বললো কোয়েন।

'হুইসেলের আওয়াজটা শুনলে?' গম্ভীর হলো বাচ। 'সিলভার আজ খেপে আছে।'

'বাদ দাও ওর কথা,' নরম সুরে বললো কোয়েন।

ভুরু কুঁচকে কোয়েনের দিকে তাকালো বাচ। কিন্তু কোয়েনের চেহারায় ভালো-মন্দ কোনো ভাব নেই। আপনমনে কাঁধ ঝাঁকালো বাচ, ভাবলো, লোকটাকে বোঝা যায় না।

পাথরখাদের সব অংশ থেকে রাস্তার মাথায়, ল্যাণ্ড-রোভারের কাছে উঠে এলো কয়েদীরা। একটা হাফ-টনী ট্রাকের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সিলভার, ট্রাকের খোলা পাটাতনে প্রকাণ্ড একটা চায়ের কেটলি। এক ধারে স্তূপ করা রয়েছে টিনের মগ, কয়েদীরা এক এক করে এগিয়ে এসে একটা করে মগ তুলে নিলো, তারপর সিলভারের সামনে দাঁড়ালো। কেটলি কাত করে প্রত্যেকের মগে চা ঢাললো সিলভার। আরেকধারে ছয়জন পুলিশ অফিসারকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন প্রিন্সিপাল

অফিসার ফোরসাইথ। নতুন একটা সিগারেট ধরালেন তিনি। কুকুরটা পায়ের কাছে বসে রয়েছে।

নিজের মগ তোলার সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলো কোয়েন। দিগন্ত রেখার কাছে একজোড়া হেলিকপ্টার। ঘাড় বাঁকা করে সেদিকে তাকিয়ে থেকেই সিলভারের সামনে দাঁড়ালো সে। সিলভার তার মগে বেশি করে চা ঢেলে দিলো, ফলে উপচে পড়লো চা। আঙুলগুলোয় গরম চায়ের ছ্যাঁকা খেয়েও কিছু বললো না কোয়েন। নিঃশব্দে ওখান থেকে সরে এসে বাচের পাশে দাঁড়ালো সে। শুনতে পেলো, প্রিন্সিপাল অফিসার বললেন, 'সাবধানে চা ঢালো, সিলভার!'

বাচও জোড়া হেলিকপ্টারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে পাশে কোয়েনের উপস্থিতি টের পেয়ে তিক্ত একটু হাসলো সে। বললো, 'কেমন হয়, ওগুলোর একটা যদি এখানে নেমে এসে আমাদেরকে তুলে নিয়ে যায়?'

দূর পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকিয়ে আপনমনে মাথা নাড়লো কোয়েন। 'কপ্টার জোড়া এইমাত্র পাহাড় চূড়ার আড়ালে হারিয়ে গেছে। 'মিছে আশা, বাচ। ওরা আর্মি এয়ার কোর-এর লোক। আগাস্টা-বেল স্কাউট 'কপ্টার। জায়গাই হবে না, শুধু পাইলট আর একজন প্যাসেঞ্জার বসতে পারে। আমাদের নিতে হলে আরো বড় কিছু লাগবে।'

মগে চুমুক দিয়ে মুখ বাঁকালো বাচ।

'কি হলো?' দ্রুত জানতে চাইলো কোয়েন।

'চা, নাকি কেরোসিন? খেয়ে দেখো, বিচ্ছিরি একটা দুর্গন্ধ।'

কোয়েন কোনো উত্তর দিলো না। পাহাড়ের আড়াল থেকে আরো দুটো হেলিকপ্টার বেরিয়ে এসেছে, সেদিকে তাকিয়ে থাকলো সে। তারপর হঠাৎ, চোখ নামিয়ে ফোরসাইথের দিকে তাকালো। কয়েক গজ দূরে একজন অফিসারের সাথে কথা বলছেন তিনি।

'ক'টা বাজলো জানতে পারি, মিঃ ফোরসাইথ?' জিজ্ঞেস করলো কোয়েন।

'কোথাও যাবার কথা ভাবছো নাকি, রিড?' সহাস্যে পাল্টা প্রশ্ন করলেন প্রিন্সিপাল অফিসার ফোরসাইথ, আশপাশের সবাই হেসে উঠলো, শুধু সিলভার বাদে।

'কেউ বলতে পারে না—যেতেও তো পারি।'

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন ফোরসাইথ। 'তিনটে পনেরো।'

'ধন্যবাদ,' বলে মাথা ঝাঁকালো কোয়েন। ডান হাতে ধরা টিনের মগটা চোখের সামনে তুললো সে, গভীর দৃষ্টিতে ভেতরে তাকিয়ে কি যেন দেখলো। তারপর ধীর পায়ে সিলভারের দিকে এগোলো।

কোয়েনকে এগিয়ে আসতে দেখে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়ালো সিলভার। একটা হাত বাড়িয়ে কেটলির পাশ থেকে তুলে নিলো চকচকে রুলারটা। বাঁ হাতের তালুতে মৃদু বাড়ি মারছে, বারবার।

সিলভারের সামনে দাঁড়ালো কোয়েন, হাতের মগটা বাড়িয়ে দিলো সামনে। 'মগের ভেতর এটা কি জিনিস, দয়া করে আমা-

কে জানাবেন, মিঃ সিলভার, স্যার ?' নরম সুরে প্রশ্ন করলো সে।

তার পিছনে কথাবার্তার আওয়াজ থেমে গেল।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ফোরসাইথ জানতে চাইলেন, 'এসব কি, কোয়েন ?'

সিলভারের চোখে চোখ রেখে জবাব দিলো কোয়েন, 'সহজ একটা প্রশ্ন, মিঃ ফোরসাইথ।' মগটা সিলভারের মুখের দিকে আরো একটু বাড়িয়ে ধরলো সে। 'আপনি কি খেয়ে দেখেছেন, মিঃ সিলভার, স্যার ?'

'এই চা কয়েদীরা খাবে,' গম্ভীর স্বরে জানালো সিলভার। 'অফিসাররা মুখে দেবে না।' তার রুলার ধরা হাতের আঙুল সাদা হয়ে গেছে।

'দিতে হবে,' শান্তভাবে বললো কোয়েন, তারপর মগের চা-টুকু ছুঁড়ে দিলো সিলভারের মুখ লক্ষ্য করে।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে এক চুল নড়লো না কেউ। এক সেকেণ্ড কোনো আওয়াজ নেই। পরমুহূর্তে কুরুক্ষেত্র বেধে গেল। হিংস্র একটা আওয়াজ ছেড়ে কোয়েনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সিলভার, মোটা রুলারটা তার মাথা লক্ষ্য করে নামিয়ে আনলো সে। সরে না গিয়ে সিলভারের গা ঘেঁষে এলো কোয়েন, কুঁজো হলো, মাথা দিয়ে গুঁতো দিলো প্রিজন অফিসারের পেটে। সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল সিলভার, তার নেমে আসা মুখে ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে প্রচণ্ড জোরে মারলো কোয়েন।

ওদের পিছনে আর সব কয়েদীরা উত্তেজনায় ছটফট করে উঠলো। কারো কথা বোঝা যাচ্ছে না, সবাই একযোগে চিৎকার

করছে। চারজন পুলিশ অফিসার লাফ দিয়ে এগিয়ে এলো, চোখের পলকে কোয়েনকে মাটিতে পেড়ে ফেললো তারা। রুলার হাতে ছুটে গেল বাকি অফিসাররা, উত্তেজিত কয়েদীরা পিছু হটতে বাধ্য হলো। মাটিতে পড়েও খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি করলো কোয়েন। হ্যাঁচকা টান দিয়ে দাঁড় করানো হলো তাকে। সাথে সাথে হাত দুটো সামনে এনে হাতকড়া পরিয়ে দেয়া হলো।

সঙ্গী অফিসাররা সাহায্য করতে এগিয়ে গিয়েছিল, তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে সিলভার। নিজের চেষ্টায় উঠে বসেছে। কোয়েনের হাঁটুর সাথে ধাক্কা লাগায় ওপর-সারির একটা দাঁত হারিয়েছে সে। আর নাকটা ভেঙে গেছে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখের রক্ত মুছছে।

স্টীল চেইনের শেষ মাথায় ঘেউ ঘেউ করছে অ্যালসেশিয়ানটা, আরো পিছিয়ে দিচ্ছে কয়েদীদের। শৃংখলা ফিরিয়ে আনার জন্যে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বারবার আদেশ করছেন প্রিন্সিপাল অফিসার ফোরসাইথ। তাঁর চেহারায় উত্তেজনার লেশমাত্র নেই, কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে আছেন। একটু পরই পরিবেশটা শান্ত হয়ে এলো। কোয়েনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন ফোরসাইথ। তাঁর মন খুঁতখুঁত করছে। চোখে দেখেও ঘটনাটা তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না যেন। কোয়েনের মতো চালাক-চতুর কয়েদী এভাবে নিজের সর্বনাশ করবে না! নিশ্চয়ই এর পিছনে কোনো রহস্য আছে।

দৃঢ় ভঙ্গিতে কোয়েনের সামনে দাঁড়ালেন তিনি। চাপা কণ্ঠে

বললেন, 'ইউ ব্লাডি ফুল! কি হারালে বুঝতে পারছো?'

চেহারায় কঠিন জেদ নিয়ে দূরে তাকিয়ে থাকলো কোয়েন। 'আমাকে গাল দেবেন না, মিঃ ফোরসাইথ,' শান্ত সুরে বললো সে। পেশীগুলো টান টান হয়ে আছে, চোখে পলক নেই।

'ছ'মাসের রেমিশন হারালে, কিন্তু কিসের বিনিময়ে, কোয়েন?' আবার জিজ্ঞেস করলেন ফোরসাইথ। কিন্তু কোয়েনের চোখের দৃষ্টি নড়লো না, আগের মতোই দূরে তাকিয়ে থাকলো সে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে সিলভারের দিকে ফিরলেন প্রিন্সিপাল অফিসার। ল্যাণ্ড-রোভারের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সিলভার, রুমাল দিয়ে মুখের রক্ত মুছছে। 'নাক ছাড়া আর কোথাও লেগেছে?'

ঠোঁট ফাঁক করে মুখের ভেতরটা দেখালো সিলভার। 'একটা দাঁত পড়ে গেছে।'

'গাড়ি চালাতে পারবে বলে মনে করো?'

মুখে রুমাল চেপে ধরে মাথা ঝাঁকালো সিলভার, ভোঁতা গলায় বললো, 'পারবো।'

অপর একজন অফিসারের দিকে ফিরলেন ফোরসাইথ: 'তোমাকে চার্জ দিয়ে যাচ্ছি, মিঃ গ্রাহাম। কোনো রকম হাঙ্গামা আমি বরদাস্ত করবো না। ফিরে এসে যেন ওদের গায়ে ঘাম দেখতে পাই।'

'ইয়েস, স্যার!' মাথা ঝাঁকালো গ্রাহাম। কয়েদীদের দিকে ফিরলো সে। হুংকার ছাড়লো, 'অ্যাটেনশন!'

সিধে হয়ে দাঁড়ালো কয়েদীরা।

'কুইক মার্চ!' মার্চ করে পাথরখাদের দিকে নেমে গেল কয়েদীরা।

হাত লম্বা করে কুকুরের চেইনে টিল দিলেন ফোরসাইথ, কুকুরটা এগিয়ে গিয়ে কোয়েনের বুট শুঁকলো। ফোরসাইথ গম্ভীর গলায় বললেন, 'তাহলে ফেরা যাক। সবুজ ল্যাণ্ড-রোভারে উঠে পড়ো। বোকার মতো কিছু করতে দেখলেই কুকুর লেলিয়ে দেবো, মনে থাকে যেন।'

কথা না বলে ল্যাণ্ড-রোভারের দিকে এগোলো কোয়েন, মাটি শুঁকতে শুঁকতে তার পিছু নিলো অ্যালসেশিয়ান। গাড়িতে উঠে একটা বেঞ্চে বসলো কোয়েন। কয়েক মুহূর্ত পর ফোরসাইথ উঠলেন। পিছনের দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলেন তিনি।

ছোট্ট একটা জানালা দিয়ে ক্যাব-এর ভেতরটা দেখা যায়। মুহূর্তের জন্যে জানালায় সিলভারের মুখ দেখা গেল। বিষ মেশানো দৃষ্টিতে কোয়েনকে একবার দেখলো সে। তারপর ফোরসাইথের দিকে তাকালো। ফোরসাইথ মাথা ঝাঁকালেন। এক মুহূর্ত পর জ্যান্ত হয়ে উঠলো ইঞ্জিন। ল্যাণ্ড-রোভার চলতে শুরু করলো।

ঢালের ওপর দিয়ে রাস্তা, কখনো নেমে গেছে, কখনো উঠে গেছে। প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকি খেলো গাড়ি। কবাটের চিকণ ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছায়া দেখতে পেলেন ফোরসাইথ। তারমানে একটা পাহাড়কে পাশ কাটাচ্ছে ওরা। চোখ ফিরিয়ে কোয়েনের দিকে তাকালেন তিনি। সামনের দিকে একটু ঝুঁকলেন। দুই ভুরুর মাঝখানে দুটো রেখা ফুটলো। 'এবার বলো

দেখি, কোয়েন, আসলে ব্যাপারটা কি ?'

ফোরসাইথকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলো কোয়েন। পাশের জানালা দিয়ে একদৃষ্টে বিস্তীর্ণ পতিতভূমির দিকে তাকিয়ে থাকলো সে। তার চেহারা শান্ত এবং নির্লিপ্ত। ফোরসাইথের মনে হলো, কিসের জন্যে যেন অপেক্ষা করছে কোয়েন।

'কোয়েন ?' আবার ডাকলেন ফোরসাইথ।

এবারও সাড়া দিলো না কোয়েন। আপনমনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন ফোরসাইথ। মনে মনে বললেন, 'মরুকগে !'

দুই

ওদের পুবে কোথাও আবার. কড়াৎ কড়াৎ করে রাইফেল গর্জে উঠলো, তারপরই একনাগাড় জবাব শোনা গেল মেশিনগানের কট-কট, কট-কট-কট। পাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন ফোরসাইথ। দুই কি তিন মাইল দূরে লাল বেরেট পরা প্যারা-ট্রুপারদের দেখা গেল, একটা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে হেঁটে যাচ্ছে। দিগন্ত রেখার নিচ থেকে উঠে এলো আরেকটা হেলিকপ্টার, যান্ত্রিক গুঞ্জন শুনে গলার ভেতর ঘরঘর আওয়াজ করলো অ্যাল-সেশিয়ানটা। সেটার পাঁজরে হাত বুলালেন ফোরসাইথ। 'ও কিছু না, বাছা, ও কিছু না।'

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেললো কোয়েন। ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকালেন ফোরসাইথ। কোয়েন জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে, আগের মতোই। তবে সামরিক বাহিনীর মহড়া সম্পর্কে তার কোনো আগ্রহ আছে বলে মনে হলো না। তাকিয়ে আছে বটে, কিন্তু কিছুই যেন দেখছে না।

কুকুরটা শান্ত হলো। হঠাৎ পশ্চিম থেকে যান্ত্রিক গর্জন ভেসে এলো। কাছের একটা পাহাড় চূড়ার মাথা ঘেঁষে বেরিয়ে এলো আরো একটা হেলিকপ্টার। দ্রুত বেগে রাস্তার ওপর চলে এলো সেটা, ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

ল্যাণ্ড-রোভারের সাথে সাথে খানিকক্ষণ উড়লো সেটা। এতো কাছে যে 'কপ্টারের গায়ে লেখা সাদা অক্ষরগুলো পরিষ্কার পড়তে পারলেন ফোরসাইথ। হ্যাচ খোলা রয়েছে, বাইরের দিকে ঝুঁকে নিচে তাকিয়ে রয়েছে একজন সৈনিক, রোদ লেগে ঝলঝল করছে তার সবুজ বেরেট।

'মনে হচ্ছে কমাণ্ডো,' মন্তব্য করলেন ফোরসাইথ।

তাকে আশ্চর্য করে দিয়ে কোয়েন বললো, 'সিকি-মারটিন ট্রুপ ক্যারিয়ার। দশ জন লোক ছাড়াও ইকুইপমেন্ট বইতে পারে। এক সময় বোর্ণিওতে ব্যবহার করা হয়েছিলো ওগুলো।'

কমাণ্ডো হাত নাড়লো, ল্যাণ্ড-রোভারকে ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেল হেলিকপ্টার। একটা ঢালের আড়ালে হারিয়ে গেল সেটা।

ঘাড় ফিরিয়ে কোয়েনের দিকে তাকালেন ফোরসাইথ। 'অনেক খবরই তুমি রাখো দেখছি।'

'গতমাসের গ্লোব ম্যাগাজিনে একটা আর্টিকেল বেরিয়েছে,' এখনো জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে কোয়েন। 'লাইব্রেরীতে আছে।'

আপনমনে মাথা নাড়লেন ফোরসাইথ। 'তুমি একটা আশ্চর্য মানুষ, রিড। স্বীকার করছি, তোমাকে আমি বুঝতে পারি না।'

অপ্রত্যাশিতভাবে হাসলো কোয়েন। ফোরসাইথের দিকে তাকালো সে। ফোরসাইথের মনে হলো, হাসলে দশ বছর ছোটো দেখায় কোয়েনকে। 'আমার বাবাও ঠিক এই কথা বলতো,' কোয়েনের মুখের হাসি ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেল। 'সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজেও নিজের কাছে দুর্বোধ্য।' ফোঁস করে আবার একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো সে। 'এখন আর চরিত্র বিশ্লেষণ করে লাভ কি। অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'তা ঠিক। অনেক দেরি হয়ে গেছে।' সিগারেটের জন্যে পকেটে হাত ভরলেন ফোরসাইথ। ঢালের মাথায় উঠে এলো ল্যাণ্ড-রোভার। ঢালের দু'পাশে ঘন জঙ্গল, দ্রুত বেগে নামতে শুরু করলো গাড়ি। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করলেন ফোরসাইথ। হঠাৎ বিস্ময়বোধক একটা শব্দ করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন তিনি। ফাঁকা একটা জায়গায় ল্যাণ্ড করেছে হেলিকপ্টারটা, জঙ্গলের কিনারায়। ছ'জন কমাণ্ডোকে দেখা গেল, রাস্তার ওপর উঠে এসে ছড়িয়ে পড়েছে।

ক্যাব-এর জানালা খুলে গেল, মুহূর্তের জন্যে সিলভারের ফোলা মুখ দেখা গেল সেখানে। ভোঁতা গলায় জিজ্ঞেস করলো সে, 'এর মানে কি, স্যার?'

'গড নোজ,' বললেন ফোরসাইথ। 'ওরা হয়তো আমাদের প্রতিপক্ষ ধরে নিয়েছে।'

ল্যাণ্ড রোভারের গতি কমিয়ে আনলো সিলভার। প্রায় থেমে গেল গাড়ি। তরুণ একজন কমাণ্ডো অফিসার সামনে এগিয়ে এলো। সঙ্গীদের মতোই, তার পরনেও কমব্যাট জ্যাকেট, ঘন

ক্যামোফ্লেজ ক্রিম মেখে থাকায় কালো হয়ে আছে মুখ।

গাড়ি পুরোপুরি থামতেই বাকি কমাণ্ডোরা ছুটে এলো। বলিষ্ঠ, কঠোর চেহারার লোক সবাই। প্রত্যেকের হাতে একটা করে মেশিন পিস্তল, কোমরের কাছে ধরে আছে। ইউনিফর্মের বোতাম লাগানো পকেটগুলো বেঢপভাবে ফুলে আছে, ভেতরে গ্রেনেড।

ক্যাব-এর দরজা খুললো সিলভার, বাইরের দিকে ঝুঁকে বিরক্তির সাথে জানতে চাইলো, 'ব্যাপারটা কি বলুন তো?'

সামনে কি ঘটছে দেখতে পাচ্ছেন না ফোরসাইথ। শুধু শুনতে পেলেন সিলভার দুর্বোধ্য একটা শব্দ করে উঠলো, অনেকটা গোঙানির মতো। তারপর ধস্তাধস্তির আওয়াজ। থ্যাচ করে বিশ্রী একটা শব্দ হলো, সম্ভবত সিলভারের ভাঙা নাকে মোক্ষম একটা ঘুসি পড়লো। তারপর নিস্তব্ধতা।

কাঁকর ছড়ানো রাস্তায় ভারি বুটের আওয়াজ, গাড়ির পাশ ঘুরে কে যেন এগিয়ে আসছে। পিছনের দরজার গায়ে, ছোট্ট জানালাটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন ফোরসাইথ। জানালার কাঁচ ঝন ঝন শব্দে চুরমার হয়ে গেল, তরুণ কমাণ্ডো অফিসার উঁকি দিলো ভেতরে। 'বেরিয়ে এসো, খোকারা,' সহাসো, আদুরে গলায় বললো সে। 'তোমাদের রাস্তা এখানেই শেষ।'

ফোরসাইথ চট্ করে একবার কোয়েনের দিকে তাকালেন। তাঁর মুখের ওপর হাসলো কোয়েন। বিদ্যুৎ চমকের মতো ফোরসাইথের কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। গোটা ব্যাপারটাই, একেবারে প্রথম থেকে, একটা পরিকল্পনার অংশ। কোয়েনের উদ্ভট আচরণ তাঁকে বিস্মিত করলেও, ঘুণাক্ষরেও তিনি ভাবেননি

এ-ধরনের কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

অকস্মাৎ গর্জে উঠে ভাঙা জানালা লক্ষ্য করে লাফ দিলো অ্যালসেশিয়ান। জানালার মাঝখানে এক মুহূর্ত আটকে থাকলো কুকুরটা, গাড়ির মেঝেতে পিছনের পা ছুঁড়ে ফাঁকটা গলে বেরিয়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করলো। হঠাৎ ওটার খুলি বিস্ফোরিত হলো, চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো রক্ত আর টুকরো হাড়—কেউ ওটার মাথায় গুলি করেছে।

বস্তার মতো ধপাস করে মেঝেতে পড়লো কুকুরটা, ভাঙা জানালায় আবার দেখা গেল তরুণ অফিসারের হাস্যোজ্জ্বল মুখ। পয়েন্ট থারটি-এইট অটোমেটিকের ব্যারেল দিয়ে ডান গালটা চুলকাচ্ছে। 'আশা করি আর কোনো ঝামেলা করবে না, বুড়ো খোকা।' মিটি মিটি হাসলো সে। 'এমনিতেই সময়ের খুব অভাব।'

কোয়েনের দিকে ফিরলেন ফোরসাইথ। যতোটা না রেগেছেন তারচেয়ে বেশি আহত হয়েছেন তিনি। 'তুমি ভুল করছো, রিড। ধরা তোমাকে পড়তেই হবে। মাঝখান থেকে শুধু শুধু দশ বছরের সাজা বাড়লো।'

'আয়োজনটা কেমন তাই বলুন,' উৎফুল্ল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো কোয়েন। 'একেবারে নিখুঁত, তাই না? এবং রাজকীয়। আপনি ওদের দক্ষতার প্রশংসা করবেন, তা না…'

'এখনো হয়তো সময় আছে, রিড,' গম্ভীর সুরে বললেন ফোরসাইথ। 'তুমি যেতে না চাইলে তোমাকে ওরা নিশ্চয় জোর করে নিয়ে যাবে না। আমার কথা শোনো…।'

সশব্দে হেসে উঠলো কোয়েন। তারপর বললো, 'আপনি আমার ভালো চান, সেজন্যে ধন্যবাদ, মিঃ ফোরসাইথ। কিন্তু ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, সেটাকে আর ফেরাবার সাধ্য আমার নেই। ইচ্ছেও নেই। নিরাপদ হেফাজতে বিশ লাখ পাউণ্ড পড়ে রয়েছে, তারপরও আমি কিভাবে জেলখানায় থাকতে পারি, বলুন?'

'তোমার বুঝি ধারণা, সত্যি তুমি পালাতে পারবে?'

'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? সব দিক ভালো করে ভেবেই ঝুঁকিটা নিয়েছি।' কোয়েনের চেহারা থেকে হাসি হাসি ভাবটা মিলিয়ে গেল। 'আপনি বরং নিজের চামড়া বাঁচাবার চেষ্টা করুন, মিঃ ফোরসাইথ। এরা লোক কিন্তু ভয়ংকর।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন ফোরসাইথ। সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'ঠিক আছে—নিজের মরণ ডেকে আনলে আমার কি করার আছে!'

'বুড়ো খোকা,' জানালা থেকে জানতে চাইলো তরুণ অফিসার, 'তোমার ভবিষ্যদ্বাণী কতো ভাগ ফলে?'

জবাব না দিয়ে পকেট থেকে চাবি বের করলেন ফোরসাইথ। দরজার দিকে ঝুঁকে তালা খুললেন। দু'জোড়া হাত ভেতরে ঢুকলো, হ্যাঁচকা টান দিয়ে নিচে নামানো হলো তাঁকে। পিছু পিছু নামলো কোয়েন।

গাড়ির পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, সিলভার, হাতকড়া পরানো হাত দুটো পিঠের ওপর।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, প্রতিটি কাজে, সুশৃংখল সামরিক

দক্ষতার পরিচয় দিলো লোকগুলো। ওদের একজন কোয়েনের হাতকড়া খুলে ফোরসাইথের হাতে পরিয়ে দিলো, অপর একজন তাঁর মুখে তুলো ভরে সার্জিক্যাল টেপ লাগিয়ে দিলো। এরই মধ্যে অজ্ঞান দেহটাকে ল্যাণ্ড-রোভারের পিছনে তোলা হয়েছে। তারই পাশে ঠাঁই পেলেন প্রিন্সিপাল অফিসার। বন্ধ করে দেয়া হলো দরজা, বাইরে থেকে চাবি ঘুরলো তালায়।

মরা কুকুরের রক্ত লাগলো ফোরসাইথের মুখে। গড়িয়ে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করছেন, এই সময় ল্যাণ্ড-রোভার চলতে শুরু করলো। বমিটাকে ঢোক গিলে গলা থেকে নামিয়ে দিলেন তিনি। ঝাঁকি খেয়ে টের পেলেন, রাস্তা থেকে নেমে এসেছে গাড়ি। মাথার ওপর পাশের জানালা, বাইরে গাছপালার মগডালগুলো দেখতে পেলেন। ঝোপ-ঝাড়ের ওপর দিয়ে এগোচ্ছে ল্যাণ্ড-রোভার। সংঘর্ষের জন্যে নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করলেন তিনি। ঢালের মাথা থেকে নিচে পড়বে গাড়ি, নাকি কোনো খাদের দিকে এগোচ্ছে?

আচমকা ব্রেক করলো ড্রাইভার। দেয়ালের সাথে ফোরসাইথের মাথা ঠুকে গেল। গাড়ির ভেতরটা অন্ধকার, ঘাম আর রক্তের গন্ধে তাঁর দম বন্ধ হয়ে এলো। কান দুটো ভোঁ ভোঁ করছে।

একটু পর তিনি উপলব্ধি করলেন, ভোঁ ভোঁ আওয়াজটা আসলে হেলিকপ্টারের। আবার ওটা টেক-অফ করছে। কুকুরটার পেটে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তিনি, দেয়ালে হাত রেখে

বেঞ্চের ওপর উঠে বসলেন।

এরই মধ্যে হেলিকপ্টারের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে গেছে।

পনেরো মিনিট পর ত্রিশ মাইল দূরে নির্জন উপত্যকায় ল্যাণ্ড করলো হেলিকপ্টার। চারদিকে গভীর বন, মাঝখানে ছোট্ট একটা ফাঁকা জায়গা। প্রথমে তরুণ অফিসার, তারপর কোয়েন লাফ দিয়ে ঘাসের ওপর নামলো। ওরা নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতেই আবার আকাশে উঠলো হেলিকপ্টার, দ্রুতবেগে পশ্চিম দিকে চলে গেল সেটা।

চারদিক নিস্তব্ধ। মিটি মিটি হাসছে তরুণ অফিসার। কোয়েন ভাবলো, এটা একটা অসুখ নাকি? হাসিটা যেন কেউ ওর মুখে সেলাই করে দিয়েছে। এমন একটা হাসি, যার কোনো অর্থ করা যায় না। কখনো মনে হয়, সরলতার প্রকাশ। আবার কখনো মনে হয়, বেয়াদবি করছে।

কোয়েনকে খুঁটিয়ে দেখলো তরুণ অফিসার, পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

ডেনিম প্যাণ্ট আর সবুজ শার্ট পরেছে কোয়েন, কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা রাকস্যাক। এ-ধরনের পোশাক সাধারণত যারা পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়, সেই সব সৌখিন ভবঘুরেরা পরে। পাল্টা দৃষ্টি হেনে কোয়েনও তরুণ অফিসারকে খুঁটিয়ে দেখলো। লম্বা, একহারা স্বাস্থ্য, পরনে ধূসর রঙা ফ্লানেল স্যুট। ক্যামোফ্লেজ ক্রিম না থাকলে চেহারাটা কেমন দেখাবে কল্পনা

করার চেষ্টা করলো কোয়েন। মুখের আকৃতি একটু লম্বাটে, তীক্ষ্ণ চেহারা, অভিজাত একটা ভাব আছে। মিটি মিটি হাসিটা বলে দেয়, অনেক দিন আগেই জীবনটাকে একটা বাজে কৌতুক বলে ধরে নিয়েছে সে, এ জীবনকে গুরুত্বের সাথে নেয়ার যেন কোনো মানে হয় না।

কথা বলার সময় চেহারায় এবং কণ্ঠস্বরে খানিকটা কর্তৃত্বের ভাব আনার চেষ্টা করলো কোয়েন, 'কি রকম সময় পাবো আমরা?'

তরুণ অফিসার কাঁধ ঝাঁকালো। 'ভাগ্য যদি ভালো হয়, এক ঘণ্টা। নির্ভর করছে পাথরখাদে ওরা প্রিন্সিপাল অফিসারের জন্যে কতোক্ষণ অপেক্ষা করবে তার ওপর। অফিসারের ফিরতে দেরি হলে ওরা খোঁজ নেবে···।'

'এক ঘণ্টা কি যথেষ্ট সময়?'

'অবশ্যই। তবে এখানে যদি খোশ গল্পে মেতে থাকি···,' কথা শেষ না করে মিটি মিটি হাসতে লাগলো তরুণ অফিসার।

বলতে গেলে প্রায় অকারণেই, গা জ্বালা করে উঠলো কোয়েনের। মনের ভাব প্রকাশ না করে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাকে আমি কি বলে ডাকবো?'

'তোমার যা খুশি, বুড়ো খোকা,' বললো তরুণ অফিসার। 'জনি হলে কেমন হয়? মন্দ নয়, কি বলো? জনি, বেশ শ্রুতিমধুর, তাই না? আমার অনেক দিনের ইচ্ছে কেউ আমাকে জনি বলে ডাকুক।'

'ভাবছি কাউন্ট তোমাকে যোগাড় করলো কোত্থেকে!'

'বুড়ো খোকা, সে-কথা শুনলে ভিরমি খাবে তুমি, সত্যি বলছি।' কি যেন স্মরণ করে মিটি মিটি হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো, শুধু চোখ বাদে।

অন্য দিকে তাকিয়ে কোয়েন জানতে চাইলো, 'এখান থেকে কোথায় যাবো আমরা?'

'আমরা নই, তুমি,' বললো সে। 'তবে খানিকটা এগিয়ে দিই তোমাকে, এসো।'

ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকলো ওরা, গাছপালা আর ঝোপ-ঝাড়ের মাঝখান দিয়ে সরু পায়ে হাঁটা পথ ধরে এগোলো। মিনিট পাঁচেক পর চওড়া মেটো পথে উঠে এলো দু'জন। দুশো গজ এগিয়ে থামলো তরুণ, রাস্তার পাশে একটা ঝর্ণা, ঝর্ণার পাশে একটা ওয়াটার-মিল দেখা গেল। আরো সামনে ভাঙা পাঁচিলের ভেতর মাঝারি একটা উঠন, উঠনের একধারে দাঁড়িয়ে আছে কালো একটা জোড়িয়াক গাড়ি।

গাড়িটার দৈন্য দশা দেখে মুখ বাঁকালো কোয়েন। 'স্টার্ট দিলে নাট-বল্টু খুলে পড়বে না তো?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'সেক্ষেত্রে তোমাকে আমি কাঁধে করে নিয়ে যাবো, বুড়ো খোকা,' সকৌতুকে বললো তরুণ।

গাড়িতে ওঠার সময় ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হলো। ড্রাইভিং সিটে বসে স্টার্ট দিলো তরুণ। উঁচু-নিচু পথ, বিষম ঝাঁকি খেতে শুরু করলো গাড়ি। আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকলো কোয়েন। এঞ্জিনের

আওয়াজ সম্ভবত দশ মাইল দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে।

মেটো পথ ছেড়ে সরু একটা পাকা রাস্তায় উঠে এলো গাড়ি। গিয়ার বদলে স্পীড বাড়িয়ে দিলো তরুণ। 'একটা কথা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার,' বললো সে। 'এই গাড়িতে চল্লিশ মিনিটের মতো একসাথে থাকবো আমরা। কিছুই ঘটবে না। কিন্তু যদি ঘটে, তোমাকে আমি লিফট দিচ্ছি—জীবনে কখনো দেখিনি, চিনি না। ঠিক আছে?'

'ঠিকাছে,' বললো কোয়েন। 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

কোনো উত্তর নেই।

প্রশ্নটা আবার করলো কোয়েন।

'সব প্রশ্ন আমি আবার শুনতে পাই না,' বললো তরুণ। 'বিশেষ করে যে প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই না।'

'কি আশ্চর্য!' চটে উঠলো কোয়েন। 'কোথায় যাচ্ছি জানতে হবে না আমাকে?'

'অবশ্যই জানবে। ঠিক যখন সময় হবে। তার আগে কয়েকটা ব্যাপার ফয়সালা হওয়া দরকার।' সেই হাসি নিয়ে কোয়েনের দিকে তাকালো তরুণ।

এবার কোয়েনও মুচকি একটু হাসলো। 'ভাবছিলাম, প্রসঙ্গটা তুলতে তুমি দেরি করছো কেন।'

'ভুলে গেছি তা ভেবো না। এ-ধরনের প্রসঙ্গ কেউ কখনো ভোলে না। ঠিক সময়ের অপেক্ষায় ছিলাম আর কি।'

'কি জানতে চাও, বলো।'

'পিটারফোল্ড এয়ারপোর্ট ডাকাতিতে তোমরা চারজন ছিলে,'

বললো তরুণ। 'তোমার ভাগে বিশ লাখ পাউণ্ড পড়ে। টাকা-গুলো কোথায় ?'

সাথে সাথে জিজ্ঞেস করলো কোয়েন, 'বলার পর আমার সাথে বেঈমানী করা হবে না, তার নিশ্চয়তা কি ?'

চোখ কপালে তুললো তরুণ। 'আমি হাসবো, না কাঁদবো ? একদম বোকার মতো কথা বললে। আমাদের কাউন্ট খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোক একেবারে পছন্দ করেন না।'

'না, মানে···।'

কোয়েনকে থামিয়ে দিয়ে আবার বললো সে, 'আমরা আমাদের কথা রেখেছি, তাই না ? তুমি এখন মুক্ত, স্বাধীন; তোমাকে আর জেলখানায় ফেরত যেতে হচ্ছে না। এবার তোমার পালা। টাকা কোথায় আছে বলো, তাহলেই অপারেশনের প্রথম পর্ব শেষ হবে। নগদ নারায়ণ হাতে এলেই শুরু হবে দ্বিতীয় পর্ব।'

'দ্বিতীয় পর্বে কি আমাকে দেশের বাইরে পৌঁছে দেয়া হবে ?'

মাথা ঝাঁকালো তরুণ। 'সাথে নতুন কাগজ-পত্র থাকবে, আরো থাকবে অর্ধেক টাকা। পনেরো বছর জেল না খাটার বিনিময়ে দশ লাখ পাউণ্ড কম ফেরত পাচ্ছো তুমি। দশ লাখ পাউণ্ড, স্বাধীনতার মূল্য হিসেবে তেমন কিছুই না। সমস্ত খরচ যখন আমাদের।'

'কিন্তু আমাকে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে না ?' ভুরু কুঁচকে আবার জানতে চাইলো কোয়েন। 'অন্তত তোমাদের আয়োজন সম্পর্কে বলো আমাকে। কি করে বুঝবো, পুলিশ আমাকে ধরতে পারবে না ?'

'তোমাকে তো আগেই জানানো হয়েছে, খেললে আমাদের নিয়মে খেলতে হবে,' বললো তরুণ। 'সময়ের আগে কিছুই তোমাকে আমি জানাতে পারি না। ইচ্ছে করলে,' মিটিমিটি হাসিটুকু তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো, 'তুমি একা যেখানে খুশি চলে যেতে পারো। তবে খুব বেশি দূর যেতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'সেটা একটা কথা বটে,' থমথমে মুখে বললো কোয়েন। 'ঠিকাছে। টাকাগুলো একটা স্টিমার ট্রাংকে আছে, নাইস ফার্ণিচার রিপজিটরি-তে, পিমলিকো-য়, মাইকেল হাইনম্যান-এর নামে।'

এই প্রথম তরুণের চেহারায় হাসি দেখা গেল না। 'বুড়ো খোক্কা, তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করছো!'

মুচকি হাসলো কোয়েন। 'আরে না! কোম্পানিটার বিশেষত্ব জানো না তাই এ-কথা বলছো। ওদের মক্কেল কারা জানো? যারা অনেক দিনের জন্যে সাগর থাকে। আমি পাঁচ বছরের ফি অগ্রিম দিয়েছি। নির্দিষ্ট সময়ে যদি ট্রাংকটা না-ও নিয়ে আসা হয়, তবু ওটা নিরাপদে থাকবে। দশ বছর না পেরুলে ওটায় ওরা হাত দেবে না—সেটাই আইন।'

'মাই গড!' মিটিমিটি হাসিটা আবার তরুণের মুখে ফিরে এলো। 'জীবনে কতো কিছুই না দেখবো! তোমার কাছে রসিদ আছে?'

'রসিদ ছাড়া ডাল গলবে না।'

'কার কাছে আছে সেটা?'

'উহুঁ, কারো কাছে নেই। কেল্টিশ শহরে আমার মার বাড়ি। ওখানে আমার কিছু জিনিস-পত্র আছে, তার ভেতর একটা পুরনো স্যালভেশন আর্মি বাইবেল পাবে। বইটার মেরুদণ্ডে রসিদটা লুকানো আছে। খুশি?'

'আমি? আমার খুশি হওয়াতে বা অখুশি হওয়াতে কিছু যায় আসে? তথ্যটা আমি জায়গামতো পৌঁছে দেবো।'

'আর আমি? আমার কি হবে?'

'তোমার দায়িত্ব নেয়ার লোক আছে, বুড়ো খোকা। সব যদি ঠিকঠাক মতো ঘটে, ওরা তাহলে দ্বিতীয় পর্ব শুরু করতে দেরি করবে না। তবে তার আগে কাউন্ট তোমার টাকার রঙ দেখতে চাইবেন।'

'আচ্ছা, এই কাউন্ট আসলে কে বলো তো?' নিচু গলায়, খানিক ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলো কোয়েন। 'আমি চিনি এমন কেউ?'

'এ-ধরনের প্রশ্ন স্বাস্থ্যকর নয়, বুড়ো খোকা,' আবার একবার তার চেহারা থেকে অদৃশ্য হলো হাসি। 'শেষ পর্যন্ত হয়তো তাঁর সাথে তোমার দেখা হবে, আবার না-ও হতে পারে। আমি আসলে জানি না।'

কিন্তু কোয়েন নাছোড়বান্দা। 'তুমি তাকে দেখেছো?'

উত্তর নেই।

'শুনেছি, উনি নাকি মিশরীয়,' বললো কোয়েন। 'আবার কেউ কেউ বলে, না, কাউন্ট আসলে ভারতীয় এক মহারাজা, রাজ্য হারিয়ে ছদ্ম-পরিচয় নিয়ে আছেন···।'

'গুজবে কান দিয়ো না,' বিড়বিড় করে বললো জনি।

'এখানে তো আর কেউ নেই, আমি কাউকে কিছু বলতেও যাচ্ছি না,' আবদারের সুরে বললো কোয়েন। 'আমার কৌতূহল ··।'

'অতি চালাকের গলায় দড়ি!'

এরপর একদম বোবা বনে গেল কোয়েন। বুঝে নিয়েছে, জনি মুখ খুলবে না।

পরবর্তী বিশ মিনিট চুপচাপ কাটলো। একটা তেমাথায় পৌঁছুলো গাড়ি। ব্রেক করলো জনি। নাট-বল্টুর খটাখট আওয়াজ তুলে দাঁড়িয়ে পড়লো জোডিয়াক। 'এখানেই তোমার সাথে আমার ছাড়াছাড়ি, বুড়ো খোকা।'

তিনটে দিকই অনেক দূর পর্যন্ত, প্রায় মাইলখানেক, পরিষ্কার দেখা গেল। দু'পাশে উঁচু-নিচু, ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা পতিতভূমি, মাঝখানে সরু ফিতের মতো মসৃণ রাস্তা। তিন দিকের কোথাও প্রাণের কোনো ছায়া পর্যন্ত নেই। নিজের অজান্তেই ভুরু কুঁচকে উঠলো কোয়েনের। 'ছাড়াছাড়ি মানে? তুমি আমাকে একা ফেলে চলে যাবে?'

'হ্যাঁ। কেন, তোমার ভয় করবে?'

'বাজে কথা বলো না!' ধমকে উঠলো কোয়েন। 'এরপর কি ঘটবে তাই বলো।'

'আরে-আরে, বুড়ো খোকা দেখি রেগে যায়!' মিটিমিটি হাসছে জনি। 'তিন রাস্তার মাথায় ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকো, যেন লিফট পাবার আশায় অপেক্ষা করছো। দশ মিনিটের মধ্যে

লিফট পাবে তুমি, দু'চার মিনিট এদিক ওদিক হতে পারে। আমাদের লোক সাধারণত দেরি করে না, তবে গাড়ি আর রাস্তার কথা জোর করে কিছু বলা যায় কি ?'

'কি গাড়ি নিয়ে আসবে সে ?'

'তা তো জানি না।'

'যদি অন্য কারো গাড়ি আগে আসে ? আমাকে যদি লিফট দিতে চায় ?'

'যাহোক একটা কিছু বলে এড়িয়ে যাবে। প্রথমে জিজ্ঞেস করবে, কোন দিকে যাচ্ছেন ? শোনার পর বলবে, না, আমি উল্টো দিকে যাবো।'

'তোমার লোককে আমি চিনবো কিভাবে ?'

'তোমাকে দেখে গাড়ি থামাবে সে,' বললো জনি। 'তোমাকে বলবে, কোথায় যেতে চাও বলো তোমাকে আমি পৌঁছে দিই। তোমার উত্তর হবে —ব্যাবিলন।'

'ফর গডস সেক, এসব কি !' রেগে গেল কোয়েন। 'সিরিয়াস একটা ব্যাপারকে তোমরা··· ।'

'আমার কথা শেষ হয়নি,' মিটিমিটি হাসছে জনি।

'ব্যাপারটাকে তোমরা একটা ছেলেমানুষি খেলা ধরে নিয়েছো··· !'

'নির্ভর করে তুমি কোন্ দৃষ্টিতে দেখছো তার ওপর। সে তোমাকে বলবে, ব্যাবিলন তার জন্যে খুব দূর হয়ে যায়, তবে পথের খানিকটা তোমাকে এগিয়ে দিতে পারে।'

'তারপর ?' মুখ ব্যাজার করে জানতে চাইলো কোয়েন।

'তা তো জানি না।' ঝুঁকে গাড়ির দরজা খুলে দিলো জনি। 'বিদায়, বুড়ো খোকা। আমাদের দেখা না-ও হতে পারে। সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ। ভাগ্য তোমার সহায় হোক। ভুলে যেয়ো না, তাহলে লিফট পাবে না—ব্যাবিলন। গুডলাক।'

তিন

নিজেকে বোকা বোকা লাগলো কোয়েনের। নির্জন রাস্তার মাঝখানে মিনিট পাঁচেক হলো একাকী দাঁড়িয়ে আছে সে। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে, আমার হয়েছে সেই দশা, নিজেকে তিরস্কার করলো মনে মনে। জিজ্ঞেস করার সাথে সাথে বলে দিলাম, কাজটা কি উচিত হয়েছে? কাউন্টকে নাহয় বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু তার লোককে কতোটুকু বিশ্বাস করা চলে? জনি যদি তথ্যগুলো কাউন্টকে না জানায়? সে নিজেই যদি পিমলিকো-য় গিয়ে রসিদটা উদ্ধার করে? কি করে জানবে সে, জনি নিজেই টাকাটা মেরে দেয়ার তাল করেনি?

অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করলো কোয়েন। বারবার হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালো, হেলিকপ্টারে থাকতে জনি তাকে দিয়েছে এটা। এক ঘণ্টা দশ মিনিট হয়েছে পালিয়েছে সে। এখন থেকে যে-কোনো ঘটনা ঘটে যেতে পারে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, অথচ কপালে চিটচিটে ঘাম দেখা দিলো। হাতের উল্টো

পিঠটা কপালে ঘষলো সে।

সাত মিনিট হলো। কোথায় জনির লোক?

তিনটে রাস্তা যে-কোনো একটা দিয়ে আসতে পারে গাড়িটা। তিন দিকের শেষ মাথায় উঁচু পাহাড় ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কালো একটা মেঘে ঢাকা পড়লো সূর্য, শীতে হি হি করে উঠলো কোয়েন। পুলিশই যদি এসে পড়ে, কি করবে সে? জেলখানায় ফিরে যাবার চেয়ে লড়াই করে মরে যাওয়া ভালো। কিন্তু লড়াইটা করবে কি দিয়ে? জনির কাছ থেকে একটা পিস্তল চাইলে হতো। অবশ্য···দিতো বলে মনে হয় না।

মুশকিল হলো কি ধরনের গাড়ি নিয়ে আসবে লোকটা তাও জানা নেই। তাহলে অন্য কোনো গাড়ি আসতে দেখলে ঝোপের আড়ালে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়া যেতো।

পায়চারি থামিয়ে ঠোঁট কামড়াতে শুরু করলো কোয়েন। গুমর ফাঁস করে দিয়ে এখন আর হায় হায় করে লাভ কি? জনিকে টাকার সন্ধান দেয়া মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। শর্ত দেয়া উচিত ছিলো, টাকার কথা আমি কাউন্টকে বলবো। কিন্তু জনি কি তা মেনে নিতো? মনে হয় না।

সত্যিই কি কেউ আসবে না? জনি তাকে ফাঁকি দিয়েছে?

হঠাৎ পুব দিক থেকে একটা যান্ত্রিক আওয়াজ ভেসে এলো। প্রায় চমকে উঠলো কোয়েন। ঝট্ করে তাকাতেই যা দেখলো তাতে চোখ কপালে উঠে গেল তার। ইচ্ছে হলো দৌড়ে পালায়। কিন্তু বিস্ময়ের ধাক্কায় নড়ার শক্তি পেলো না সে। পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে আসছে একটা—গাড়ি নয়, ট্যাংকার।

একটা কথা মনে হতে পালাবার ইচ্ছেটা দূর হলো। পুলিশ ট্যাংকার নিয়ে আসবে না। প্রকাণ্ড আকারের ছয়টা চাকা, ট্যাংকারের গা উজ্জ্বল লাল রঙে রাঙানো। ঠিক ওর পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো সেটা।

ক্যাব থেকে ঝুঁকে নিচে তাকালো ড্রাইভার। ষাটের কম নয় বয়স, মুখের ভাঁজগুলো যেন মাকড়সার জাল। ময়লা একটা ক্লাইং জ্যাকেট পরে আছে। সুতী ক্যাপ। গলায় মাফলার। কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বললো না। নিস্তব্ধতা ভাঙলো বুড়োই। তার কথার টান শুনে কোয়েনের মনে হলো, লোকটা বোধহয় স্কটল্যাণ্ডের। 'কোথায় যেতে চাও বলো তোমাকে আমি পৌঁছে দিই।'

পরম স্বস্তির পরশ অনুভব করলো কোয়েন, প্রায় পুলকের মতো। 'ব্যাবিলন।'

'ব্যাবিলন আমার জন্যে খুব দূর হয়ে যায়, তবে পথের খানিকটা তোমাকে আমি এগিয়ে দিতে পারি।'

মাথা ঝাঁকালো কোয়েন।

দরজা খুলে একটা লোহার মইয়ে পা রাখলো ড্রাইভার। ফিলিং পয়েণ্টটা ট্যাংকারের মাথায়, মই বেয়ে সেখানে ওঠা যায়। একপাশে একটা ইস্পাতের প্লেট, চৌকো, আকারে প্রায় দুই বর্গ ফিট, কালো রঙ করা। গোটা গোটা লাল অক্ষরে লেখা রয়েছে: ডেঞ্জার—হ্যাণ্ডল উইথ কেয়ার—হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। প্লেটের গোড়ায় আঙুল বুলিয়ে লুকানো একটা বোতামের স্পর্শ নিলো সে, চাপ দিতেই স্যাঁৎ করে খুলে গেল

ঢাকনি।

মই বেয়ে উঠে ভেতরে উঁকি দিলো কোয়েন। তিন ফিট চওড়া, আট ফিট লম্বা একটা কমপার্টমেন্ট, মেঝেতে মোটা একটা কম্বল বিছানো রয়েছে। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো সে, জানতে চাইলো, 'কতোক্ষণ?'

'ছ'ঘণ্টা,' বললো ড্রাইভার। 'দুঃখিত, ভেতরে আলোর কোনো ব্যবস্থা নেই। সিগারেটও খেতে পারবে না। তবে ফ্লাস্কে চা আছে, আর একটা টিনে কয়েকটা স্যাণ্ড-উইচ পাবে।'

'জানতে পারি, কোথায় যাবো আমরা?'

মাথা নাড়লো ড্রাইভার, থমথমে চেহারা। 'চুক্তির মধ্যে বলা আছে, তুমি আমাকে কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না, আমিও তোমাকে কোনো প্রশ্ন করতে পারবো না।'

কাঁধ ঝাঁকালো কোয়েন। 'বেশ, চলো কোথায় নিয়ে যাবে,' বলে হ্যাচের ভেতর মাথা গলিয়ে দিলো সে। ভেতরে ঢুকে মুখ তুলে আলোর দিকে তাকাতে যাবে, ঘটাং আওয়াজের সাথে প্লেটটা জায়গামতো বসলো, গাঢ় অন্ধকারে কোয়েনের মনে ভয় ধরে গেল।

অনেক কষ্টে গলায় উঠে আসা চিৎকারটা থামালো সে। বারবার ঢোক গিলেও শুকনো খসখসে ভাবটা রয়ে গেল গলায়। নিজের হাত পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না সে। একটু পরই গড়াতে শুরু করলো ট্যাংকার, ভয়ের অনুভূতিটা ধীরে ধীরে ছেড়ে গেল তাকে। কম্বলের ওপর শুলো সে, হাত দুটোকে বালিশ বানালো। শরীরটা দোল খেতে শুরু করলো। চোখ বুঁজে এলো। একটু পর

ঠিক ওই সময়, মাইল দশেক দূরে, জনি নামের সেই লোকটা হঠাৎ ব্রেক কষে মেইন রোডের ওপর দাঁড়িয়ে পড়লো। রাস্তার পাশেই গ্রাম, তার আসার পথে এটাই প্রথম।

গাড়িতে বসে গ্রামটাকে ভালো করে দেখে নিলো সে। ছোটো গ্রাম, প্রায় ফাঁকা রাস্তা। দু'একজন লোক কাজ থেকে ফিরছে। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে গ্রামের সরু পথে নামলো সে। খানিক দূর যেতেই পাবলিক টেলিফোন বুদ চোখে পড়লো। গাড়ি থামালো সে, কোনো দিকে না তাকিয়ে বুদে ঢুকলো। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে লণ্ডনের একটা নাম্বারে ডায়াল করলো সে।

অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া দিলো একটি মেয়ে। নির্লিপ্ত, ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর। 'ইউনিভার্সাল এক্সপোর্ট লিমিটেড।'

'রবার্ট পিয়ারসন, ওয়েস্ট কান্ট্রি থেকে বলছি।'

গলার স্বর একই রকম থাকলো। 'খুশি হলাম তুমি যোগাযোগ করলে। ওদিকের খবর সব ভালো তো?'

'এর বেশি ভালো কিছু হতে পারে না। আমাদের মক্কেল তার পথে রওনা হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে খবরে কিছু বললো?'

'না, একদম চুপ।'

'ঝড়ের আগে থমথমে ভাব। নগদ নারায়ণের সবটুকুই তুমি নাইস ফর্নিচার রিপজিটরিতে পাবে, একটা স্টিমার ট্রাংকে। ওটা পিমলিকো-য়। ট্রাংকটা মাইকেল হাইনম্যানের নামে আছে।'

'রসিদ !'

জনি ওরফে রবার্ট পিয়ারসন মিটিমিটি হাসছে। 'কেন্টিশ টাউনে ওর মার বাড়ি। ওর জিনিস-পত্রের মধ্যে পুরনো একটা স্যালভেশন আর্মি বাইবেল আছে, রসিদটা ওটার মেরুদণ্ডে পাবে।'

'তারমানে···।'

'হ্যাঁ,' কথা কেড়ে নিয়ে জনি বললো, 'তারমানে সুন্দরী একজন ওয়েলফেয়ার অফিসার বুড়ি মার কাছ থেকে অনায়াসে ওটা আদায় করে আনতে পারবে।'

'ভাবছি কাজটা আমি নিজেই করবো।'

'তুমি সুন্দরী এই কথাটাই ঘুরিয়ে বলছো।'

'এবং আমার দাবি তুমি অস্বীকার করছো না।'

হাসিটা জনির সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো, শুধু চোখ বাদে। 'সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। এরইমধ্যে প্রায় পাঁচটা বাজে। ফার্নিচার রিপজিটরি সম্ভবত ছ'টায় বন্ধ হয়ে যাবে। বুদ্ধিমতীর কাজ হবে তুমি যদি রওনা হবার আগে ওদেরকে একটা টেলিফোন করো। তোমার জন্যে তাহলে খোলা থাকবে ওরা।'

'আমার ওপর ছেড়ে দাও। খুব ভালো হয়েছে তোমার কাজ। উনি খুশি হবেন।'

'তাঁর খুশিতেই আমার খুশি, বুড়ি মেয়ে।' রিসিভার রেখে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো জনি, চোখে ঝাপসা দৃষ্টি, যেন বহুদূরে তাকিয়ে আছে। 'সুন্দরী, যদি জানতে তোমাকে নিয়ে কি করতে চাই আমি!' মৃদু কণ্ঠে বিড়বিড় করলো সে। বুদ

থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে এগোলো। হাত দুটো নিশপিশ করছে, যেন কারো গলা টিপে ধরতে চায়। কি যেন কল্পনা করে তার সারা শরীরে পুলক খেলে গেল। ঠোঁটের নিঃশব্দ হাসিটা এখন কেউ যদি দেখে আঁতকে উঠবে সে। কারো চেহারায় এমন উজ্জ্বল আর নগ্ন নিষ্ঠুর ভাব ফুটতে পারে, না দেখলে ভাবা যায় না।

ধীরে ধীরে ঘুম ভাঙলো কোয়েনের। অন্ধকারে তাকিয়ে থাকলো সে, আন্দাজ করার চেষ্টা করলো কোথায় রয়েছে। তারপর ঝট্ করে সব মনে পড়ে গেল। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে মাথা তুললো সে। হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালে চোখ বুলালো। সোয়া দশটা বাজে, তারমানে পাঁচ ঘণ্টার কিছু বেশি গাড়িতে রয়েছে ওরা। কোথাও নিশ্চয় পৌঁছুবে সে, তার বোধ-হয় খুব বেশি দেরিও নেই। হাতের ওপর মাথা দিয়ে আবার শুলো সে। কতো কি চিন্তা এসে ভিড় জমালো মনে।

বিশেষ করে একটা চিন্তা বারবার ফিরে এলো। কিভাবে জীবন কাটাবে সে। কোথায়।

রোদ ঝলমলে সুন্দর একটা জায়গা, অবশ্যই সৈকত থাকতে হবে। একটা ছোটো, একটা বড়, দুটো গাড়ি থাকবে তার। আর থাকবে একটা বোট। সেখানে সব মেয়েরাই সুন্দরী আর মিশুক।

হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেয়ে বাস্তবে ফিরে এলো কোয়েন। ড্রাই-ভার ব্রেক করছে, ধীরে ধীরে ট্যাংকারের গতি কমে আসছে। থামলো, কিন্তু এঞ্জিন বন্ধ হলো না। হ্যাচটা খুলে গেল, ফাঁকে

ড্রাইভারের মুখ। রাতের আকাশের গায়ে ম্লান একটা মুখোশ। 'বেরিয়ে এসো।'

একেবারে সেই দিগন্তরেখা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে তারাগুলো, তবে আকাশের কোথাও চাঁদ নেই। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়েচেড়ে আড়ষ্ট ভাব দূর করলো কোয়েন। হ্যাচ বন্ধ করে ক্যাবে ফিরে এলো ড্রাইভার। ওপর থেকে নিচের দিকে তাকালো।

স্থির হয়ে গেল কোয়েন। 'এরপর?'

'রাস্তা পেরিয়ে খানিকদূর গেলে সরু একটা পায়ে চলা পথ পাবেন,' বললো ড্রাইভার। 'পথটা পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। পথের মোড়ে অপেক্ষা করুন। আপনাকে তুলে নেয়া হবে।'

কোয়েন কিছু বলার আগেই ক্যাবের দরজা বন্ধ করে দিলো ড্রাইভার। হিস করে তীব্র একটা আওয়াজের সাথে রিলিজ হলো ব্রেক, অন্ধকারে গড়াতে শুরু করলো ছ'টা চাকা। বোকার মতো তাকিয়ে থাকলো কোয়েন, ট্যাংকারের টেইল লাইট ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে। বহুদূর···শেষ প্রান্তে এক সময় হারিয়ে গেল লাল আলো। রাকস্যাকটা তুলে নিয়ে রাস্তা পেরুলো সে।

আপনমনে বিড়বিড় করে কথা বলছে কোয়েন। ভালো লোকদের পাল্লায় পড়া গেছে। তবে ঘাবড়াবার তেমন কিছু নেই, এদের আয়োজন হাস্যকর হলেও, তাতে কাজ উদ্ধার হয়। এভাবে ভালোয় ভালোয় দেশের বাইরে চলে যেতে পারলে আর চিন্তা কি।

মেটো পথটা পেতে কোনো অসুবিধা হলো না। আঁকাবাঁকা পথ, দুশো গজের মতো হেঁটে এসে মোড়ে থামলো সে। সরু পথটা চওড়া পথে মিশেছে। দু'দিকে তাকিয়ে খুব বেশি দূর দেখা গেল না, কোনো দিকেই আলো নেই। তবু অন্ধকারের ভেতর চোখ জ্বালার চেষ্টা করলো কোয়েন। আওয়াজটা শুনে এমন ভয় পেলো, আঁতকে উঠে প্রায় চিৎকার করতে যাচ্ছিলো।

'কোথায় যেতে চাও বলো, তোমাকে আমি পৌঁছে দিই।'

মিষ্টি, মেয়েলি কণ্ঠ। ধাতস্থ হতে কয়েক মুহূর্ত সময় নিলো কোয়েন। ইচ্ছে হলো বলে, খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে, কিন্তু বললো না। 'ব্যাবিলন।' আওয়াজটা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে তাকিয়ে মেয়েটাকে দেখার ব্যর্থ চেষ্টা করলো সে।

'ব্যাবিলন আমার জন্যে খুব দূর হয়ে যায়, তবে পথের খানিকটা তোমাকে আমি এগিয়ে দিতে পারি।'

মেয়েটা কাছে সরে এলো, তারার আলোয় এবার তার কাঠামো দেখতে পেলো কোয়েন। দেখা দেয়ার জন্যেই কাছে এসেছিল, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলো মেয়েটা। তাড়াতাড়ি পিছু নিলো কোয়েন, যেন হারিয়ে ফেলার ভয় আছে। ওদের পায়ের চাপে মুট মুট আওয়াজ করছে কাঁকর। পাঁচ ঘণ্টা ঘুমালেও ক্লান্তি বোধ করলো কোয়েন। শরীরের আর দোষ কি, সারাটা দিন ধকল তো আর কম যায়নি। কল্পনার চোখে সুস্বাদ খাবারদাবার আর নরম একটা বিছানা দেখতে পেলো সে। আর পাশে যদি একটা মে···

আচ্ছা, এই মেয়েটা দেখতে কেমন? বয়স কতো?

'একটু দাঁড়াবে ?'

মেয়েটা কিন্তু থামলো না। 'কেন ?'

'সিগারেট ধরাবো।'

'উচিত হবে না।'

কেন উচিত হবে না তা আর জিজ্ঞেস করলো না কোয়েন। মনে মনে ভাবলো, আলোর মধ্যে যাই চলো, দেখবো কেমন তুমি।

সারাক্ষণ ঢাল বেয়ে উঠলো ওরা। প্রায় আধ মাইল পেরিয়ে এসে কোয়েন টের পেলো, ওদের দু'ধারেই পাহাড়। হুল ফোটানো ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, শীতে একটু একটু কাঁপছে সে। বাঁক নিয়ে পাহাড়ের কাঁধে পৌঁছুলো পথটা, নিচের খাদে একটা ঝর্ণা, পাশে ফার্মহাউসটাকে আবছামতো দেখা গেল, নিচের তলার একটা জানালায় আলো জ্বলছে।

ঠেলা দিয়ে গেট খুললো মেয়েটা, দূরে কোথাও একটা কুকুর ফাঁপা গলায় ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। পুরনো লোহার গেট, বন্ধ করার জন্যে ভেতর দিকে পাঁচটা মোটা বার রয়েছে। উঠনের ওপর দিয়ে পথ দেখিয়ে এগোলো সে।

সামনের দরজার কাছাকাছি পৌঁচেছে ওরা, বিস্ফোরিত হলো কবাট। পিছনে আলো নিয়ে চৌকাঠে দাঁড়ালো এক লোক, হাতে একটা শটগান। 'ওকে নিয়ে এসেছো তাহলে, রোয়েনা ? সব ঠিক আছে তো ?'

মেয়েটা শুধু মাথা ঝাঁকালো, কথা বললো না। এক চিলতে আলোয় তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল কোয়েন। এতো কম

বয়স, টেনেটুনে আঠারো কি উনিশ হবে। অথচ এই বয়সেই চোখের নিচে কালি, মুখটা শুকনো, দৃষ্টিতে রাজ্যের বিষাদ। মেয়েটা হাসতে জানে কিনা সন্দেহ হলো কোয়েনের। মুখের দু'পাশে হাড়গুলো বেঢপভাবে ঠেলে বেরিয়ে আছে, কদর্য একটা ভাব এনে দিয়েছে চেহারায়। কিন্তু ময়লা কোটে উথলানো যৌবন ঢাকা পড়েনি। পাঁচ বছর কোনো মেয়ের সংস্পর্শে আসেনি, কোয়েনের সারা শরীরে রক্তের বান ডাকলো। ঘন ঘন ঢোক গিললো সে।

সম্বিত ফিরলো মেয়েটার কথায়। লোকটাকে সে জিজ্ঞেস করলো, 'আর কোনো কাজ আছে আমার?' নিষ্প্রভ, বেসুরো কণ্ঠ।

'না, লক্ষ্মী সোনা; না। যাও, মায়ের বিছানায় গিয়ে আরাম করো। তোমার মা তোমাকে খুঁজছিলো।'

লোকটাকে পাশ কাটিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল রোয়েনা। দেয়ালের গায়ে শটগানটা ঠেস দিয়ে রেখে সামনে এগোলো লোকটা, ডান হাত বাড়িয়ে দিলো। 'আপনাকে মেহমান হিসেবে পেয়ে আমরা খুশি, মিঃ কোয়েন। আমি হোফার টুইড।'

'আমি কে আপনি তাহলে জানেন?'

'রেডিও তো সারারাত ধরে আপনার গানই গাইছে।'

'আমি কোথায় ওদের জানার কোনো সম্ভাবনা আছে?' জিজ্ঞেস করলো কোয়েন।

খিক খিক করে হাসলো হোফার টুইড। চল্লিশের মতো বয়স হবে, রোগা-পাতলা, নড়াচড়ার মধ্যে অদ্ভুত দ্রুত একটা গতি

আছে। 'রওনা হবার পর সাড়ে তিনশো মাইল দূরে চলে এসেছেন আপনি, মিঃ কোয়েন। আর যেখানেই খুঁজুক, এখানে কেউ আপনাকে খুঁজবে না।'

'আপনার কথায় স্বস্তি পেলাম,' বললো কোয়েন। 'এখন কি ঘটবে? কখন শুরু হবে দ্বিতীয় পর্ব?'

'এক ঘণ্টাও হয়নি লণ্ডন থেকে ফোন এসেছিল। সব কিছুই ঠিকঠাক মতো ঘটছে। কর্তৃপক্ষ আপনাকে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করে দিয়েছেন।' ঘাড় ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকালো হোফার টুইড। 'ডুগান—হঠাৎ গেলে কোথায়, ডুগান? এসো, চেহারাটা দেখাও একবার।'

উঠন থেকে অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো লোকটা, দেখার মতোই একখানা চেহারা বটে। কম করেও ছয় ফিট চার ইঞ্চি লম্বা হবে, হাতির মতো পা, বন মানুষের মতো হাত। এই মুখ কোনো গরিলার কাঁধে বসিয়ে দিলেও মানিয়ে যাবে। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ বলে মনে হয় না, অনেকটা যেন আধপাগলা গোছের। কোনো কারণ ছাড়াই হাঁ করে হাসছে, মুখের কোণ থেকে মোটা সুতোর মতো লালা ঝরছে বুকে। হোফার টুইডের ঠিক পাশে নয়, একটু সামনে দাঁড়ালো সে, টুইড তার কাঁধ চাপড়ে দিলো। আদর পেয়ে অঁক অঁক করে দুর্বোধ্য আওয়াজ করলো সে।

'লক্ষ্মী ছেলে, ডুগান। যা বলি তাই শোনে। চলো, দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। কাজটা শেষ করা দরকার।' কোয়েনের দিকে ফিরে হাসলো হোফার টুইড। 'কি করতে হবে ও জানে। এদিক

দিয়ে, মিঃ কোয়েন।'

উঠনের ওপর দিয়ে পথ দেখিয়ে এগোলো টুইড। মাঝখানে পড়ে গেল কোয়েন। পিছনে থাকলো ডুগান। অন্ধকার উঠন, একটা ছোটো গেটের সামনে থামলো টুইড। ঘটাং ঘটাং আওয়াজের সাথে খুলে গেল সেটা। গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে কোয়েন দেখলো, ছোটো একটা উঠনে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। প্রায় ফাঁকাই বলা চলে, শুধু মাঝখানে একটা কুয়া রয়েছে, নিচু পাঁচিল দিয়ে গোল করে ঘেরা। ফিট তিনেক উঁচু হবে পাঁচিলটা।

অস্থিরভাবে এক পা সামনে এগিয়ে কোয়েন জানতে চাইলো, 'এখানে কি?'

গেটের পাশ থেকে আগেই ভারি শাবলটা তুলে নিয়েছে ডুগান। সেটা মাথার ওপর তুলে দাঁড়িয়ে ছিলো সে। কোয়েনের প্রশ্নের জবাবে শাবলটা সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘাড়ের ওপর নামিয়ে আনলো। পচা পাটখড়ির মতো মট করে ভেঙে গেল কোয়েনের শিরদাঁড়া।

উঠনে পড়ে কোয়েনের শরীর মোচড় খেতে লাগলো। জুতোর ডগা দিয়ে তার পেটে আর পাঁজরে খোঁচা মারলো টুইড, অনেকটা কাতুকুতু দেয়ার ভঙ্গিতে। কাতর শরীরের এই মোচড় খাওয়া উপভোগ করছে সে, খোঁচা মারার কারণ হলো হঠাৎ যেন থেমে না যায়।

নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ বের করলো ডুগান।

'ও, তর সইছে না!' আহ্লাদে গলায় বললো টুইড। 'দাও

তাহলে ফেলে।'

কুয়ার মুখ থেকে নিচে নামার সময়ও বেঁচে রয়েছে কোয়েন। ইটের দেয়ালে দু'বার ধাক্কা খেলো সে, কিন্তু কোনো বাধা অনুভব করলো না। আশ্চর্যই বলতে হবে, তার শেষ সচেতন চিন্তাটা ছিলো, ফোরসাইথ ঠিকই বলেছিলেন—নিজের মরণ ডেকে আনলে আমার কি করার আছে। এমন একটা ভুল যা সংশোধন করার সুযোগ মেলে না। ঠাণ্ডা হিম পানি গ্রাস করলো তাকে। নাই হয়ে গেল দুনিয়া।

চার

দুপুরের হুইসেল বাজতেই রুথম্যান মেটাল ইণ্ডাস্ট্রি থেকে পিল-পিল করে বেরিয়ে আসতে শুরু করলো শ্রমিকরা। মেইন গেটের উল্টোদিকের কাফেতে বসে কফিতে চুমুক দিতে গিয়েও কাপটা নামিয়ে রাখলো মাসুদ রানা, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। খবরের কাগজটা ভাঁজ করে বগলদাবা করে অলস পায়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। ঠিক এই সময়টার অপেক্ষাতেই ছিলো ও।

–রাস্তা পেরোবার সময় পিছন দিকে তাকালো একবার। না, কাফে থেকে আর কেউ বেরোয়নি। টেলিফোন বুদেও ঢোকেনি কেউ। লণ্ডনের এই মিল-কারখানা এলাকায় উপমহাদেশের প্রচুর লোক কাজ করে, কাজেই ওকে দেখে কারো মনে কোনো রকম সন্দেহ না হবারই কথা।

রুথম্যান মেটাল ইণ্ডাস্ট্রির প্রধান ফটকে একটা সুইংবার রয়েছে। কোনো গাড়ি মিল থেকে বাইরে বেরুবার আগে ইউনি-ফর্ম পরা গার্ডরা সেটাকে চেক করে, তারপর বার সরানো হয়।

ফটকের পাশেই ছোটো একটা গেট, সেটাই ব্যবহার করে শ্রমিক আর কর্মচারীরা। গেটটা সরু, ফলে বিরতিহীন মিছিলটা বিস্ফোরণের মতো বেরিয়ে আসছে বাইরে। ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি চলছে, তারই সাথে চলছে হাস্য-কৌতুক।

জনসমুদ্রে ঢুকে গিয়ে স্রোতের উল্টো দিকে এগোলো রানা, আশপাশে হুবহু একই পোশাক পরা বহুলোক কিলবিল করছে—খয়েরি ওভারঅল আর সুতী ক্যাপ। গেটের কাছে পৌঁছুতে দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে গায়ের জোর খাটাতে হলো, দু'একজনকে কনুই দিয়ে গুঁতোও মারতে হলো। তবে হাড়ে হাড়ে টের পেলো, কনুই চালানো ইংরেজদের কাছ থেকে শিখতে হবে বাঙালীদের। বঙ্গসন্তান হিসেবে রানা অবশ্য দুর্লভ একটা গুণের পরিচয় দিলো—সারা শরীরে প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন ব্যথা নিয়েও মুখে অম্লান হাসি ফুটিয়ে রাখলো।

গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢোকার পর যুদ্ধজয়ের আনন্দ অনুভব করলো রানা। ভেতরেও প্রচুর লোকজন, তবে টিন-ভর্তি মুড়ির মতো নয়। বাঁ দিকে গেট হাউস, পাশ কাটাবার সময় চট্ করে জানালা দিয়ে ভেতরটা দেখে নিলো ও। টেবিলের সামনে তিনজন ইউনিফর্ম পরা সিকিউরিটি গার্ড, তাদের সামনে স্যাণ্ডউইচ আর কফি, এক কোণে আধ হাত জিভ বের করে বসে রয়েছে একটা অ্যালসেশিয়ান।

লোকজন ধীরে ধীরে গেটের দিকে এগোচ্ছে, উঠন পেরিয়ে মেইন ব্লক-এ ঢুকে পড়লো রানা, সেখান থেকে চলে এলো বেসমেন্ট গ্যারেজে। কাল রাতে বিল্ডিংটার প্ল্যান দেখার সুযোগ

হয়েছিলো ওর। গোটা লে-আউট মনে গেঁথে আছে, চোখ বুজে ঘুরে বেড়াতে পারবে।

আশপাশে এখনো জনা কয়েক মেকানিক ঘুর ঘুর করছে, তাদের গ্রাহ্য না করে র‍্যাম্প বেয়ে উঠলো রানা, লোডিং বে-তে পার্ক করা অপেক্ষারত যানবাহনগুলোর পিছন দিক ঘুরে সার্ভিস লিফটের কাছে চলে এলো। বোতাম টিপে দাঁড়িয়ে থাকলো, আশপাশে কাউকে দেখলো না। লিফট নামলো।

চারতালায় উঠলো রানা। লিফট থেকে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো ও। চারদিকে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। স্বাভাবিক, শান্ত ভাবে করিডর ধরে এগোলো ও। ওয়েজ অফিসের দরজায় 'প্রাইভেট' লেখা রয়েছে, করিডরের শেষ মাথা পর্যন্ত আরো দুটো দরজা দেখা গেল। বন্ধ ওয়েজ অফিসকে পাশ কাটালো রানা, বাঁক নিয়ে ফায়ার এগজিট লেখা দরজাটা খুলে ফেললো। কংক্রিটের সিঁড়ি অন্ধকার কুয়ার ভেতর নেমে গেছে, ওর বাঁ পাশের দেয়ালে সার সার ফিউজ বক্স।

প্রতিটি বক্সের গায়ে সাদা রঙ দিয়ে নম্বর লেখা। দশ নম্বরের হাতল ধরে টানলো ও, অফ পজিশনে এনে ছেড়ে দিলো। দরজা বন্ধ করে ফিরে এলো করিডরে।

ওয়েজ অফিসের দরজায় নক করলো রানা। এটাই বিপজ্জনক মুহূর্ত। ওর জানামতে, বারোটা থেকে একটার মধ্যে লাঞ্চ খেতে যায় স্টাফরা, থাকে শুধু একা চীফ ক্যাশিয়ার। কিন্তু রোজই যে একই ঘটনা ঘটবে তার কোনো মানে নেই। নিয়মের ব্যত্যয় হতেই পারে কেউ হয়তো ক্লান্ত বোধ করছে, পিয়নকে দিয়ে

স্যাণ্ডউইচ আনিয়ে টেবিলেই বসে পড়েছে। দু'জন হলে সামলাতে পারবে, তার বেশি হলেই বিপদ। যদিও, বিপদ ঘটলেও কিছু এসে যায় না, কারণ শেষ পর্যন্ত ফলাফল সেই একই হবে। আপনমনে হাসলো রানা। তবে, এই সুযোগে দেখাই যাক না, আসলে কতো দূরে যেতে পারে ও।

কবাটের গায়ে স্পাই-হোলের ঢাকনি সরে গেল, একটা চোখের ঝিলিক দেখতে পেলো রানা। 'মিঃ বেকার?' জিজ্ঞেস করলো ও। 'আমি মেইন্টেন্যান্স থেকে আসছি।'

'ইয়েস?'

'এই তলার কোথাও কোথাও নাকি বিদ্যুৎ নেই, গোলযোগটা কোথায় জানার জন্যে প্রতিটি অফিস চেক করছি আমি। এখানে সব ঠিক আছে তো, স্যার?'

'এক মিনিট।' স্পাইহোলের ঢাকনি জায়গামতো নেমে এলো। এক মুহূর্ত পর চেইন নাড়াচাড়ার আওয়াজ শুনলো রানা। দরজা খুলে গেল, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একমাথা পাকা চুল নিয়ে ছোটোখাটো চেহারার এক প্রৌঢ়। 'দেখুন কি কাণ্ড, কোনো আলোই তো জ্বলছে না!' সরে গিয়ে রানাকে পথ ছেড়ে দিলো ক্যাশিয়ার। 'আসুন।'

ভেতরে ঢুকলো রানা, চট করে অফিসের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলো। স্টিফেন বেকার একাই রয়েছে। দরজায় তালা লাগালো সে, তারপর চেইন আটকালো। বয়সের তুলনায় একটু যেন বেশি বুড়িয়ে গেছে লোকটা, সরু ফ্রেমের চশমা পরে আছে। চেইন লাগিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই পয়েন্ট থ্রি-

এইট সেমি অটোমেটিকের মুখোমুখি হলো সে। চোখ জোড়া নিমেষে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। ঝুলে পড়লো কাঁধ। রানার চোখের সামনে আরো যেন ছোটো হয়ে গেল লোকটা।

একটু করুণা বোধ করলো রানা, অনুভূতিটা ঝেড়ে ফেলে লোকটার মুখের পাশে অটোমেটিকের ব্যারেল দিয়ে আস্তে করে টোকা দিলো। 'যা বলি শুনুন, আপনার কোনো ক্ষতি হবে না—বুঝতে পারছেন?' আতংকিত বেকার যন্ত্রচালিতের মতো মাথা ঝাঁকালো। ওভারঅলের পকেট থেকে একজোড়া হাতকড়া বের করলো রানা, ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখালো লোকটাকে। 'ওটায় বসে হাত দুটো পিছনে নিয়ে যান।'

লোকটার হাতে দ্রুত হাতকড়া পরালো রানা, এক প্রস্থ নাইলন কর্ড দিয়ে গোড়ালি জোড়া এক করে বাঁধলো। 'খুব বেশি ব্যথা লাগছে কি?'

বেশ দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়েছে ক্যাশিয়ার। ক্ষীণ হাসলো সে, যদিও ঠোঁট জোড়া কাঁপতে লাগলো। বললো, 'ডাকাত, কিন্তু অতি ভদ্র। না—আর লাগলেই বা কি! আপনার কাজ তো আপনাকে করতেই হবে!'

'আমাদের পেশা আলাদা হতে পারে,' কৌতুক করে বললো রানা, 'কিন্তু কেউই তো আর জঙ্গল থেকে আসিনি। সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ, মিঃ বেকার।'

'এবার বোধহয় আমার মুখে টেপ লাগাবেন?'

'একটু পরে লাগাই, কেমন?' হাসলো রানা। 'তার আগে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন, প্লিজ। এখানে আপনার ওয়েজ বিল

হয় দেড় থেকে সোয়া দু'লাখ পাউণ্ড, নির্ভর করে ওভারটাইম কি পরিমাণ হলো তার ওপর। চলতি হপ্তার অংকটা কতো?'

'সোয়া দু'লাখ পাউণ্ড,' এতোটুকু ইতস্তত না করে জবাব দিলো ক্যাশিয়ার। 'আরেক হিসেবে, মাত্র এক টন ওজনের একটা বোঝা। কেন যেন আমার ধারণা হচ্ছে, টাকাগুলো নিয়ে বেশি দূর আপনি যেতে পারবেন না।'

'সে দেখা যাবে,' বললো রানা।

অফিসের যেদিকেই তাকালো রানা, শুধু টাকা আর টাকা। কোথাও স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে বাণ্ডিলগুলো, ব্যাংক থেকে আনার পর ওগুলোয় এখনো হাত দেয়া হয়নি। তবে বেশিরভাগ নোট এরইমধ্যে কাঠের ট্রে-র পকেটে জায়গা পেয়েছে। স্ট্রংরুমের দরজা খোলা, ভেতরে খুচরো পয়সা ভর্তি অনেকগুলো ক্যানভাস ব্যাগ। দ্রুত হাতে ব্যাগগুলো খালি করলো রানা। ট্রলি ঠেলে টেবিলের পাশে আনলো। ট্রে-র পকেট আর শেলফে রাখা টাকাগুলো তাড়াহুড়ো করে ভরে ফেললো ব্যাগগুলোয়। বেকার মিথ্যে বলেনি, বিরাট একটা বোঝাই বটে। সমস্ত টাকা ব্যাগে ভরতে তিন মিনিট লেগে গেল রানার।

ট্রলি ঠেলে দরজার দিকে এগোলো রানা।

পিছন থেকে ক্যাশিয়ার বললো, 'বন্ধুর একটা উপদেশ ছিলো।'

দরজার কাছে ট্রলি রেখে ফিরে এলো রানা। 'বলুন।'

'আপনি হয়তো জানেন না, রয়্যাল এয়ারফোর্সের প্রচুর

কাজ করি আমরা,' বললো ক্যাশিয়ার। 'আর তাই, আমাদের সিকিউরিটি সিস্টেম একটু বিশেষ ধরনের।'

'আমি কি ভেতরে ঢুকিনি?'

'ঢোকা আর বেরুনো কি এক কথা হলো?' পাল্টা প্রশ্ন করলো ক্যাশিয়ার। 'বিশেষ করে আপনি যখন এতগুলো ব্যাংক নোট ঠেলে নিয়ে যাবেন। তাছাড়া, গাড়ি পাবেন কোথায়? গাড়ি যদি পানও, গেট দিয়ে বেরুবেন কিভাবে? সশস্ত্র গার্ডদের দেখেননি ওখানে? চেক না করে কোনো গাড়িকে যেতে দেয় না ওরা।' মুখ বাঁকালো প্রৌঢ়। 'আপনার সমস্যা দেখে আমারই খারাপ লাগছে।'

'ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করার সময় নেই বলে দুঃখিত,' বললো রানা। 'তবে, কাগজের সান্ধ্য সংস্করণ কিনতে যেন ভুলবেন না। ওরা আমার হয়ে সমস্যার সমাধানটা ছেপে দেবে বলে কথা দিয়েছে।'

'যদি বেরিয়ে যেতে পারেন তাহলে বলবো আপনি সত্যিই প্রতিভাবান,' গম্ভীর কণ্ঠে বললো ক্যাশিয়ার। 'আর যদি প্রতিভাবান হন তাহলে জিজ্ঞেস করবো, এতো থাকতে এ-লাইনে কেন?'

ফোঁস করে সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো রানা। 'এটাই আমার উত্তর।' পকেট থেকে বড় একটা প্লাস্টার বের করলো ও, ক্যাশিয়ারের মুখে লাগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ঠিকমতো নিশ্বাস ফেলতে পারছেন তো?' মাথা ঝাঁকালো ক্যাশিয়ার, চেহারা কালচে হয়ে গেছে। সান্ত্বনাসূচক হাসি দেখা গেল

রানার ঠোঁটে। 'দুশ্চিন্তার কিছু নেই, একটু পরই কেউ না কেউ এসে পড়বে। সহযোগিতার জন্যে আরেকবার ধন্যবাদ।'

বেকারের পিছনে একটু পর বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ঘরে বা বাইরে, কোথাও কোনো শব্দ নেই। পঞ্চান্ন বছরের জীবনে এতোটা নিঃসঙ্গ আর কখনো বোধ করেনি সে। মনে হলো ডাকাতি হবার পর এক যুগ পেরিয়ে গেছে, এই সময় ভারি পায়ের আওয়াজ শোনা গেল বাইরে। ঘন ঘন টোকা পড়লো কবাটে।

পাঁচ

সমস্যাটা বেশ পুরনো, এবং গুরুতর তো বটেই; কিন্তু ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের গোচরে এলো অনেক পরে। ইতিমধ্যে ব্যাপারটার সাথে একা শুধু স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড নয়, রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখাও জড়িয়ে পড়েছে।

বি-এস-এস চীফ উইলিয়াম ম্যানফ্রেড রাতেই পুলিশ কমিশনারের টেলিফোন পেয়েছিলেন। সমস্যা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দেয়া হয়েছে তাঁকে। তবে ব্যাপারটা নিয়ে যেহেতু স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিটেকটিভ চীফ সুপারিনটেনডেন্ট জ্যাক মারভিন মাথা ঘামাচ্ছে, ঠিক হলো, সকাল দশটায় তার সাথে একবার বসবেন তিনি। তৃতীয় একটা পক্ষ হলো রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখা, ওরা নাকি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে চায়। উইলিয়াম ম্যানফ্রেড ওদেরকে সময় দিয়েছেন এক ঘণ্টা পর অর্থাৎ এগারোটায়। পুলিশ কমিশনার ফোনেই তাঁকে আভাস দিয়ে রেখেছেন, এজেন্সির ডিরেক্টর মাসুদ রানা

লণ্ডনে রয়েছেন, তিনিই হয়তো তাঁর সাথে দেখা করতে আসবেন।

প্রাইভেট সেক্রেটারীকে ইন্টারকমে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন উইলিয়াম ম্যানফ্রেড। সাক্ষাৎপ্রার্থী ভদ্রলোক দু'জন কাজ সেরে বিদায় না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে বিরক্ত করা চলবে না।

ডিটেকটিভ চীফ সুপারিনটেনডেন্ট জ্যাক মারভিন কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময় এলো। বাঘের মতো চেহারা লোকটার, গরিলা আকৃতির শরীর নিয়ে থপ থপ করে হাঁটে। সাদা পোশাকে এসেছে, কিন্তু তার হাবভাব আর চেহারাই বলে দেয় —জাঁদরেল পুলিশ অফিসার। উইলিয়াম ম্যানফ্রেড চেয়ার ছাড়লেন না, হাতও বাড়ালেন না। মারভিনের গুড মর্ণিঙের জবাবে ছোটো করে মাথা ঝাঁকালেন শুধু। তারপর ইঙ্গিতে ডেস্কের ওধারের খালি একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। হাতঘড়ির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, 'নিন, শুরু করুন।'

কাজের লোকদের সাথেই ওঠা-বসা মারভিনের, এ-ধরনের ব্যবহারের সাথে তার পরিচয় আছে। কোনো ভূমিকা না করে সরাসরি কাজের কথাই পাড়লো সে, 'একেবারে প্রথম থেকে শুরু করি। সমস্যাটা হলো কয়েদীদের নিয়ে—যারা জেল থেকে পালায়। এটা একটা স্থায়ী সমস্যা, বরাবর ছিলো, ভবিষ্যতেও থাকবে। গড়পড়তায় বছরে, এই ধরুন, আড়াইশোর মতো পালাতো···'

'আড়াইশো?' মারভিনকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ম্যানফ্রেড, তাঁর পাকা ভুরু কুঁচকে উঠলো। 'ফি বছর এতো লোক

পালাচ্ছে ? এবং আপনি বলছেন এই সংখ্যা ইদানীং আরো বেড়েছে ?' ডেস্ক থেকে প্যাকেট তুলে তুর্কী সিগারেট বের করলেন তিনি। 'খুবই বিপজ্জনক বলতে হয়।'

লালমুখো বাঘের গোঁফের নিচে ক্ষীণ হাসি দেখা গেল। 'বিপজ্জনক, হ্যাঁ। কিন্তু পালানোর এই হার অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

'নয় ?' ম্যানফ্রেডের শিরদাঁড়া প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে খাড়া হয়ে থাকলো।

'দেড়শোর মতো কয়েদী খোলা জেল থেকে সেফ হেঁটে চলে যায়, ঠেকাবার কোনো উপায় নেই,' বললো মারভিন। 'জেলখানার বাইরে কাজ করতে পাঠানো হয় বছরে লাখ খানেক কয়েদীকে, বাছাই করেই পাঠানো হয় তাদের। বড়জোর তর্ক করা যেতে পারে, বাছাইয়ে গলদ থাকে। বিয়ে, জন্মদিন, রোগ-শোক ইত্যাদি উপলক্ষ্যে প্যারোলে ছাড়া পায় যারা তাদের মধ্যে থেকে পালায় আরো পঞ্চাশ জন। একবার ছাড়া পেলে এই পঞ্চাশ জন আর ফিরে আসে না।'

'হলো দুশো।'

'বাকি পঞ্চাশজন আক্ষরিক অর্থেই জেল ভেঙে পালায়।'

'এদের সংখ্যাই কি ইদানীং বাড়ছে ?'

'হ্যাঁ। গত বছরখানেক ধরেই বাড়ছে। জেল ভেঙে পালানোর প্রায় প্রতিটি ঘটনাই চমকপ্রদ, দুঃসাহসিক সব ঝুঁকি নিতে দেখা যায়। ইদানীং যে-সব ঘটনা ঘটছে সেগুলো আরো বেশি অর্থাৎ আগের চেয়েও চমকপ্রদ, কিন্তু ঝুঁকির মাত্রা কম। এখনকার

জেল ভাঙার প্ল্যানগুলো একেবারে নিখুঁত, পরিষ্কার বোঝা যায়, কোনো প্রতিভাবানের ছোঁয়া রয়েছে। অত্যাশ্চর্য ঘটনা গত ক'-মাসে অনেকগুলোই ঘটলো, একটাও আমরা ঠেকাতে পারিনি।'

'দুঃখজনক ব্যর্থতা।'

'ট্রেন ডাকাত উইলসনকে দিয়ে ব্যাপারটা শুরু হয়,' বলে চললো মারভিন। 'ব্রিমিংহাম জেল থেকে তাকে বের করে নিয়ে গেলে সারা দেশ আঁতকে ওঠে। এই প্রথম একটা গ্যাং আক্ষ-রিক অর্থে জেল ভেঙে কাউকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।'

'কমাণ্ডো স্টাইলে।'

'ওদের প্ল্যানটা ছিলো নিখুঁত, মিঃ ম্যানফ্রেড।'

'এই ঘটনাটার পরই তো কাউন্টের নাম প্রথম শোনা গেল, তাই না?' জিজ্ঞেস করলেন সিক্রেট সার্ভিস চীফ।

মাথা ঝাঁকালো মারভিন। 'আমাদের জানামতে, চলতি বছর আঠারোটা বড় ধরনের জেল ভাঙার জন্যে দায়ী সে।'

'তার আর সব কৃতিত্ব সম্পর্কে বলুন।'

'আণ্ডারগ্রাউণ্ডে একটা পাইপলাইন তৈরি করে রেখেছে লোকটা, ফেরার আসামী বা গ্রেফতার হতে পারে এমন সব ক্রিমিনালদের এই পাইপলাইন দিয়ে দেশের বাইরে পাচার করে। দু'বার আমরা তার অর্গানাইজেশনের দু'জন লোককে গ্রেফতার করি—ওদের কাজ ছিলো ক্রিমিনালদের রিসিভ করে আরেক জায়গায় ডেলিভারি দেয়া।'

'নিংড়ে কিছু বের করা গেছে?'

'না, ওরা কিছু জানলে তো! পাইপলাইনটা কাউন্ট কিভাবে

তৈরি করেছে, জানেন ? এই সিস্টেমটা প্রথম চালু করে রেজি-স্ট্যান্স, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফ্রান্সে। একজন লোক শুধু তার নিজের নির্দিষ্ট কাজটুকু সম্পর্কে জানে। কাজের পরবর্তী ধাপ সম্পর্কে জানলেও জানতে পারে, কিন্তু তার বেশি নয়। এর মানে হলো, কেউ যদি ধরা পড়ে, তাহলেও গোটা অর্গানাই-জেশনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় না।

'তারমানে কেউ জানে না কাউন্ট লোকটা আসলে কে ?'

'গোস্ট স্কোয়াড ন'মাস ধরে আদাজল খেয়ে লেগে আছে, কিছুই জানতে পারেনি। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, সাধারণ কোনো ক্রিমিনাল নয় সে। হি ইজ সামথিং স্পেশাল। তবে…,' খানিক ইতস্তত করলো মারভিন, '… থাক, গুজব গুজবই, ও-সবে কান দিয়ে লাভ নেই।'

'গুজব জিনিসটা চাটনির মতো—টক-ঝাল-মিষ্টি।'

'সত্যি আপনি শুনতে চান ?' বলার আগে বাঘের চেহারা আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। 'কারো কারো ধারণা, কাউন্টের নাকি কোনো অস্তিত্বই নেই। অর্গানাইজেশন চলে বোর্ড অভ ডিরে-ক্টরদের নির্দেশে। তবে ওদের নাকি একটা অত্যাধুনিক কমপিউ-টর আছে, সিদ্ধান্তগুলো সেটার কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়। সাধারণ কোনো কমপিউটর নয়, দেখতেও নাকি মানুষ আকৃতির…।'

'ঠিক কি বলতে চাইছেন ? রোবট ?'

'শুনে তো তাই মনে হয়,' ইতস্তত করে বললো মারভিন। 'সত্যি-মিথ্যে জানি না। কোনো প্রমাণ নেই। আগেই তো

বলেছি, মিঃ ম্যানফ্রেড, শ্রেফ গুজব।'

'এতোক্ষণ আপনাদের ব্যর্থতার ইতিহাস শুনলাম,' ম্যানফ্রেড বললেন। 'এবার বলুন, এর সাথে রানা এজেন্সি জড়ালো কিভাবে।'

'তার আগে, মিঃ ম্যানফ্রেড, এই ফাইলটার ওপর একবার চোখ বুলাতে অনুরোধ করি,' বলে ব্রিফকেস খুলে একটা ফোল্ডার বের করে সিক্রেট সার্ভিস চীফের সামনে রাখলো মারভিন।

ফোল্ডারটা খুলে ম্যানফ্রেড দেখলেন, বারো পৃষ্ঠার একটা রিপোর্ট। সবটুকু পড়ার ধৈর্য হলো না, প্রয়োজনও বোধ করলেন না। প্রথম, শেষ, আর মাঝখানে দেড় পৃষ্ঠার ওপর দ্রুত চোখ বুলালেন তিনি। তারপর মাথা নাড়লেন। 'রিপোর্টের উপসংহারে বলা হয়েছে, কাউন্ট সম্পর্কে কিছু জানার একমাত্র উপায় হলো তার একজন হবু মক্কেলের ওপর নজর রাখা—অর্থাৎ হয় সেই মক্কেলকে অনুসরণ করতে হবে, অথবা মক্কেলের ভূমিকায় নিজেদের একজন লোককে অভিনয় করাতে হবে। প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। এই মুহূর্তে তিন থেকে সাড়ে তিন লাখ লোক জেল খাটছে, কাউন্টের সম্ভাব্য মক্কেল কে হবে তা খুঁজে বের করার উপায় কি?'

নিজের অজান্তেই গোঁফে তা দিলো মারভিন। 'বাতিল করার সিস্টেম ধরে এগোলে কাজটা পানির মতো সহজ,' বললো সে। 'কি ধরনের কয়েদীর প্রতি তার আকর্ষণ, আমরা জানি। শুধু যাদের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড হয়েছে, এবং যাদের কাছে মোটা

অংকের টাকা লুকানো আছে।' ব্রিফকেস থেকে এবার ছোট্ট একটা ফোল্ডার বের করলো সে। ফোল্ডার থেকে বেরুলো টাইপ করা একটা কাগজ, আর তিনটে ফটোগ্রাফ। 'এটা একটা তালিকা, মিঃ ম্যানফ্রেড। শেষ নাম দুটো দেখুন, তারপর দেখুন ফটো তিনটে।'

দুটো নামের প্রথমটা পড়লেন ম্যানফ্রেড। 'রিড কোয়েন—এর কথা আমার মনে আছে। ক'মাস আগে ডার্টমুর থেকে পালিয়েছে লোকটা। রয়্যাল মেরিন কমাণ্ডোস-এর ছদ্মবেশ নিয়ে একটা গ্যাং প্রিজন ভেহিকেল অ্যামবুশ করে, ওখানে তখন সামরিক মহড়া চলছিল। তারপর লোকটার কোনো খবর পেয়েছেন?'

'না। রিড কোয়েন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। পিটারফিল্ড এয়ারপোর্ট ডাকাতিতে রিড কোয়েন সহ চারজন ছিলো, প্রত্যেকের বিশ বছর করে জেল হয়। ঘটনাটা আপনার মনে আছে কি?'

মাথা নাড়লেন ম্যানফ্রেড। ঠোঁটে চেপে ধরা সিগারেটে ছোটো ছোটো টান দিলেন কয়েকটা। ডেস্কে কোনো ছাইদানি নেই, কারণ ধূমপান ছেড়ে দিয়েছেন। তবে অভ্যেসটা তাঁকে ছাড়েনি, তাই সিগারেট না ধরিয়ে টান দিয়ে শুধু তামাকের সুগন্ধ নেন।

'পাঁচ বছর আগের ঘটনা। নর্দার্ণ এয়ারওয়েজের একটা ডাকোটা হাইজ্যাক করে ওরা। ডাকোটায় পুরনো নোট ছিলো আশি লাখ পাউণ্ডের—সেন্ট্রাল স্কটিশ ব্যাংক থেকে পাঠানো

হচ্ছিলো লণ্ডনের ব্যাংক অভ ইংল্যাণ্ডে। চমৎকার নিখুঁত একটা কাজ, স্বীকার করতেই হবে। দলে ওই চারজনই ছিলো ওরা, টাকাসহ নিরাপদে কেটে পড়ে।'

'অর্থাৎ ধরা পড়লো অনেক পরে?'

'হ্যাঁ। সেণ্ট্রাল ব্যাংক এক লাখ পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। রিড কোয়েনের বান্ধবী লোভটা সামলাতে পারেনি।'

'কিন্তু টাকাগুলো আর উদ্ধার করা যায়নি।'

'না।'

'ধরা পড়লো ক'জন? একা রিড কোয়েন?'

'না, ধরা চারজনই পড়েছে।'

'পালিয়েছে একা রিড কোয়েন?'

মাথা নাড়লো মারভিন। 'প্রথমে পালায় জন হেরিক। তারপর রিড কোয়েন। বাকি থাকলো রিপ হটন, আর জো সলোমন।'

রিড কোয়েনের ফটোটা ডেস্কে নামিয়ে রাখলেন ম্যানফ্রেড। 'আমার হাতে বাকি দুটো ফটো তাহলে ওদের?'

'না,' বললো মারভিন। 'একটা, প্রথমটা, ওদের একজনের—রিপ হটনের। জো সলোমনের ফটো আপনার হাতে নেই।'

'তাহলে দ্বিতীয় ফটোটা কার?'

'ওটা মিঃ বদরুল হাসানের ফটো,' বললো মারভিন। 'বদরুল হাসান রানা এজেন্সির একজন এজেণ্ট, লণ্ডন শাখায় কাজ করে···মানে, করতো।'

'হোয়াট ডু ইউ মিন?' ঠোঁটে সিগারেট তুলতে গিয়ে থমকে

গেলেন ম্যানফ্রেড।

'রাতের অন্ধকারে, সবার অগোচরে, রিপ হটনকে তার সেল থেকে বের করে অন্য জায়গায় সরিয়ে দেয়া হয়,' বললো মারভিন। 'তার বদলে সেলে ঢোকে বদরুল হাসান, রিপ হটনের ছদ্মবেশ নিয়ে। এটা তিন মাস আগের ঘটনা।'

রিপ হটনের ফটোর দিকে তাকালেন ম্যানফ্রেড, তারপর বদরুল হাসানের চেহারাটাও দেখলেন। রিপ হটন নিগ্রো, ছদ্মবেশ নেয়া বদরুল হাসানের জন্যে কঠিন কোনো সমস্যা হয়নি—দু'জনের শারীরিক গঠন প্রায় একই রকম। 'কিন্তু কেন?'

'জন হেরিক আর রিড কোয়েন জেল থেকে পালাবার পর আমরা আন্দাজ করে নিই, এবার হয় রিপ হটন নাহয় জো সলো মনের পালা। তাই রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখার সাহায্য চাই আমরা।'

'কেন?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন ম্যানফ্রেড। 'একটা বেসরকারি ইনভেস্টিগেটিং ফার্মের সাহায্য চাওয়ার দরকার পড়লো কেন? স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যোগ্য লোকের অভাব দেখা দিয়েছে?'

'ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, মিঃ ম্যানফ্রেড,' নরম সুরে বললো মারভিন। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আমরা যারা কাজ করি তাদের সব একটা দুর্বলতা হলো চেহারা দেখে এক মাইল দূর থেকে পুলিশের লোক বলে চেনা যায়। অথচ রিপ হটনের ভূমিকায় নামানোর জন্যে এমন একজন লোক দরকার হলো আমাদের যাকে

কোনোমতেই পুলিশ বলে মনে হওয়া চলবে না। রিপ হটন একজন ক্রিমিনাল, তার ছদ্মবেশধারীকেও ক্রিমিনালের মতো দেখাতে হবে, তা না হলে পাঁচ মিনিটও টিকবে না সে। এই সব সমস্যার কথা ভেবে ওপর মহল থেকে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়, কোনো ইনভেস্টিগেটিং ফার্মের সাহায্য চাওয়া হবে···।'

'এবং তালিকার প্রথমেই ছিলো রানা এজেন্সির নাম···।'

'স্বভাবতই, মিঃ ম্যানফ্রেড। সারা পৃথিবীতে ওরাই তো সবচেয়ে নাম করেছে, তাই না?'

'তারপর কি হলো বলুন,' জানতে চাইলেন ম্যানফ্রেড। 'বদরুল হাসান রিপ হটনের ভূমিকায় জেলে ঢুকলো। রিপ হটন গেল কোথায়?'

'তাকে অন্য এক জেলে পাঠানো হয়, এমন একটা সেলে যেখানে জেল সুপার ছাড়া আর কেউ যেতে পারে না। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়, কাউকে কিছু বুঝতে দেয়া হয়নি।'

'তারপর? কাউন্টের লোকেরা রিপ হটন মনে করে বদরুল হাসানের সাথে যোগাযোগ করলো?'

'করলো,' মাথা ঝাঁকালো মারভিন। 'এবং জেল থেকে বেরও করে নিয়ে গেল তাকে। কিন্তু···।'

'কিন্তু?'

'তারপর আর তার কোনো খবর নেই।'

'মানে?' শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল সিক্রেট সার্ভিস চীফের। 'আপনাদের সাথে তার গোপন যোগাযোগ ছিলো না?'

'না। জেলের ভেতর কাউন্টের লোক থাকাটা স্বাভাবিক, তাই

যোগাযোগ না রাখাটাই নিরাপদ মনে করা হয়েছিল। আমরা হাসানের নিরাপত্তার প্রশ্নও তুলেছিলাম, কিন্তু রানা এজেন্সির তরফ থেকে বলা হয়, কিভাবে নিজেকে রক্ষা করতে হয় হাসানের তা জানা আছে। মোট কথা ওরা ওদের পদ্ধতিতে কাজ করতে চাওয়ায় আমরা আর নাক গলাইনি।'

'কতোদিন আগের কথা?'

'বদরুলকে জেল থেকে বের করে নিয়ে গেছে···,' হিসেব করে মারভিন জানালো, 'আজ উনিশ দিন।'

'ঘটনাটার বর্ণনা দিতে পারেন?'

'ঠিক যেভাবে উইলসনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল,' বললো মারভিন। 'বারোজন সশস্ত্র লোক রাতের অন্ধকারে জেল ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ে। গ্রেনেড আর স্মোকবম ফাটিয়ে, রিভলভার ছুঁড়ে আতংক সৃষ্টি করে। সবাই মাস্ক পরেছিলো। মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছিল একটা হেলিকপ্টার, সেটা থেকে টিয়ারগ্যাসের শেল ফেলা হয়। বাইরে গাড়ি ছিলো ওদের, কিন্তু বদরুলকে হেলিকপ্টারে তুলে দেয়া হয়। জেলখানার শৃংখলা ফিরে আসতে মিনিট পনের সময় লাগে, ইতিমধ্যে নিরাপদ দূরত্বে চলে যায় ওরা। তারপর অনেক খুঁজেও কোনো হদিশ করা যায়নি। সেই থেকে বদরুল হাসানেরও কোনো খবর নেই। তিনি কোথায়—বেঁচে আছেন কিনা, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।'

'রিড কোয়েন আর জন হেরিকের মতো সে-ও তাহলে বাতাসে মিলিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'এ-ব্যাপারে রানা এজেন্সির প্রতিক্রিয়া কি?' জানতে চাইলেন ম্যানফ্রেড। দাঁত দিয়ে সিগারেটের ফিল্টার কামড়ে ধরলেন তিনি।

'এজেন্সির ডিরেক্টর মিঃ মাসুদ রানা তিন দিন হলো খবর পেয়ে লণ্ডনে পৌঁচেছেন,' বললো মারভিন। 'দুটো দিন ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত করার পর কাল বিকেলে পুলিশ কমিশনারের সাথে দেখা করেন তিনি। কমিশনারকে তিনি জানান, এ-কেসে পুলিশ নাকি হালে পানি পাবে না, দায়িত্ব নিতে হবে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সকে। কাউন্ট নাকি এসপিওনাজের সাথেও জড়িত। সেজন্যেই তিনি আপনার সাথে-দেখা করতে চেয়েছেন। তাঁর কথায় নিশ্চয় যুক্তি আছে, তা না হলে কমিশনার আমাকে আপনার কাছে পাঠাতেন না।'

চোখ বুঁজে সমস্ত ঘটনা, যা যা শুনেছেন, সব একবার স্মরণ করলেন উইলিয়াম ম্যানফ্রেড। তারপর ঢুলুঢুলু চোখে তাকালেন তিনি। 'তাহলে হাতে থাকলো শুধু একজন, সবেধন নীলমণি জো সলোমন?'

'জী।'

'আপনাদের ধারণা, এরপর তার পালা?'

'জী।' মারভিন ক্লান্ত। চোখে নির্লিপ্ত দৃষ্টি।

'লোকটাকে নিয়ে আপনাদের কোনো প্ল্যান আছে?'

'আমাদের নেই,' বললো মারভিন। 'মাসুদ রানার আছে। রিপোর্টটা পড়লেই জানতে পারবেন। কমিশনার তার প্ল্যান অনুমোদন করেছেন, সম্ভাব্য সব রকম সাহায্যও করা হবে

তাকে। তবে, কমিশনার চান, প্ল্যানটা যেন সিক্রেট সার্ভিসও অনুমোদন করে।'

'এবার, লোকটা সম্পর্কে কি জানেন বলুন।'

ব্রিফকেস থেকে আরেকটা ফোল্ডার বের করে বাড়িয়ে দিলো মারভিন। 'জো সলোমনের ডোশিয়ে।'

ফোল্ডার খুলে প্রথমে ফটোটা বের করলেন ম্যানফ্রেড, তাকিয়ে থাকলেন একদৃষ্টে। কারো চেহারা আর ভঙ্গির মধ্যে বুদ্ধির উজ্জ্বল দীপ্তির সাথে পশু-শক্তির অস্থিরতা এভাবে মিশে থাকতে আগে কখনো দেখেননি তিনি। জো সলোমনের মুখের একটা কোণ ব্যঙ্গভরা হাসিতে বাঁকা হয়ে আছে। সাথে সাথে আকৃষ্ট হলেন ম্যানফ্রেড, ফোল্ডারের কাগজগুলো দ্রুত পড়ে ফেললেন।

জো সলোমনের বয়স বত্রিশ। সতেরো বছর বয়সে নেভীতে যোগ দিয়েছিল সে। ফকল্যাণ্ড যুদ্ধে মটর টর্পেডো বোটে পেটি অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে, যুদ্ধের পর শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগে চাকরি হারায়। চাকরি হারালেও সমুদ্রেই বাসা বাঁধে সলোমন, সেই বছরই চোরাচালানের মালামাল সহ ধরা পড়ে সে। ছ'মাস জেল খেটে বেরিয়ে পরের বছর আবার গ্রেফতার হয় ট্রেন ডাকাতির অভিযোগে, কিন্তু প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে যায়। সেই থেকে ডাকোটা হাইজ্যাক করার আগে আর কখনো তাকে জেল খাটতে হয়নি বটে, কিন্তু পুলিশ তাকে নানা ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত সন্দেহে মোট বত্রিশ বার ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

'চরিত্র বটে একখানা,' ম্যানফ্রেড বললেন। 'অপরাধের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে লোকটা নিজের কৃতিত্বের পরিচয় রাখার চেষ্টা করেনি।'

'আপনাকে মিথ্যে বলবো না,' বাঘের মতোই ঘড়ঘড়ে শোনালো মারভিনের গম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'ভিলেনদের প্রতি আমার কোনো দরদ না থাকলেও, এই লোকটার প্রতি একেবারে নেই তা বলতে পারবো না। যুদ্ধের পর ওর যদি চাকরি না যেতো, তার বদলে ওর যদি পদোন্নতি হতো, নেভীর একটা রত্ন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতো লোকটা।'

'এখন সে বিশ বছরের জেল খাটছে?'

'খাটছে। তবে বেশি দিন খাটবে বলে বিশ্বাস হয় না। জন হেরিক খাটছে না, রিড কোয়েন খাটছে না, সবাই জানে রিপ হুটনও খাটছে না।'

'কোথায় রাখা হয়েছে তাকে?'

'ফ্রাইডেথর্প-এ। ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা হয়েছে ওখানে, কিন্তু তারও তো একটা সীমা আছে, তাই না? তাছাড়া, একজন অসুস্থ লোকের সাথে কতো আর নিষ্ঠুর ব্যবহার করা যায়?'

'অসুস্থ?'

'মাস তিনেক আগে মৃদু একটা স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছিল সে।'

ম্যানফ্রেড ফটোটার ওপর আবার একবার চোখ বুলালেন। 'দেখে তো যথেষ্ট সুস্থ বলে মনে হচ্ছে। স্ট্রোক? নাকি ভান?'

'ইলেকট্রোএনকেফ্যালোগ্রাফ তো মিথ্যে বলবে না,' মারভিন

তিক্ত একটু হাসলো। 'ব্রেনের ওয়েভ প্যাটার্নেও গুরুতর গোল-যোগ ধরা পড়েছে। ড্রাগ ব্যবহার করে হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ-গুলো আদায় করা সম্ভব, কিন্তু স্ট্রোকের লক্ষণ আদায় করা সম্ভব নয়। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চেক করা হয়েছে তাকে। তিন দিনের জন্যে ম্যানিংহ্যাম জেনারেল হাসপাতালে রাখা হয়েছিল।'

'মারাত্মক একটা ঝুঁকি নয়? আমি হলে তো ভাবতাম সলো-মনকে ছিনিয়ে আনার এটা একটা মোক্ষম সুযোগ।'

মারভিন মাথা নাড়লো। 'বেশিরভাগ সময় অজ্ঞান ছিলো সে। সীল করা একটা ওয়ার্ডে রাখা হয়েছিল তাকে, বিছানার পাশে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলো দু'জন প্রিজন অফিসার।'

'জেলখানার ভেতর তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় না?'

'না। সুযোগ-সুবিধের অভাব। আর সব জেলখানার মতো ফ্রাইডেথর্পে সিক বে, আর একজন ডাক্তার আছে, তবে কেউ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে লোকাল হসপিটালের সীল করা ওয়ার্ডে পাঠান হয়।'

'কিন্তু কেউ যদি দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকে?'

'সেক্ষেত্রে তাকে ওয়ার্মউডের প্রিজন হসপিটালে পাঠানো হয়,' বললো মারভিন। 'তবে সলোমনের কেস এতোটা সিরি-য়াস নয় যে তাকে কোনো হাসপাতালে রাখার দরকার আছে। তাছাড়া, সিরিয়াস হলেই বা কি, হোম অফিস তার ট্রান্সফার অনুমোদন করবে না। কোনো হাসপাতালেই ম্যাক্সিমাম সিকিউ-রিটির ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তার মতো কয়েদীকে প্রিজন হসপি-

টালে পাঠানোর মানেই হবে লণ্ডন গ্যাং-গুলোকে সুযোগ করে দেয়া—যেভাবে হোক সলোমনকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে তারা।'

'হুম,' বলে হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন ম্যানফ্রেড। এগারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। 'ধন্যবাদ, মিঃ মারভিন। গোটা ব্যাপারটা আমি জানলাম। এবার দেখা যাক রানা এজেন্সির কি বলার আছে।'

ইঙ্গিত পেয়ে চেয়ার ছাড়লো মারভিন। দু'সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকলো সে, কিন্তু ম্যানফ্রেড মুখ তুলে তাকালেন না—ডেস্কের ওপর ঝুঁকে রিপোর্টটা পড়তে শুরু করেছেন গভীর মনোযোগের সাথে।

'গুডলাক, মিঃ ম্যানফ্রেড,' বলে থপ থপ পা ফেলে দরজার দিকে এগোলো মারভিন।

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন ম্যানফ্রেড, দরজা খোলার এবং বন্ধ হওয়ার আওয়াজ শুনলেন।

কাঁটায় কাঁটায় এগারোটায় ডেস্কের ইণ্টারকম বেজে উঠলো।

বোতাম টিপে ম্যানফ্রেড বললেন, 'ইয়েস?'

প্রাইভেট সেক্রেটারি বললো, 'মিঃ মাসুদ রানা, স্যার।'

'আমি তার জন্যে অপেক্ষা করছি।' রিপোর্টের শেষ কটা লাইনে চোখ বুলিয়ে ফোল্ডারে ভরে রাখলেন কাগজগুলো।

নক হলো দরজায়। ফোল্ডার ভাঁজ করে চোখ তুললেন ম্যানফ্রেড। খুলে গেল কবাট। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে খোলা একটা তলোয়ার। ম্লান, ধূসর রঙের জ্যাকেট পরেছে রানা, সাদা ট্রাউজার, সাদা শার্ট—তবু যেন অদৃশ্য একটা আভা

বেরিয়ে আসছে ওর সমগ্র অস্তিত্ব থেকে। চোখে মায়া, কিন্তু দৃষ্টিতে ক্ষুরের ধার। ক্ষিপ্রতা আর দ্রুতগতির লাগাম টেনে ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

রিভলভিং চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন ম্যানফ্রেড। হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'গ্লাড টু মিট ইউ, মিঃ মাসুদ রানা। আপনি নিজে আসায় আমি খুব আনন্দিত।'

এগিয়ে এসে হ্যাণ্ডশেক করলো রানা। 'আমার সৌভাগ্য।'

'বসুন, প্লিজ,' একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন ম্যানফ্রেড। রানা বসলো। সাথে সাথে কাজের কথা পাড়লেন তিনি, 'আপনার ধারণা কাউন্ট একটা ইন্টেলিজেন্স কেস। কারণটা কি বলুন তো?'

'ঘটনাটা আপনার মনে আছে?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'তিন বছর আগে চেস্টার কেইন, বিখ্যাত নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট, রাশিয়ায় তথ্য পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার হয়? এ-বছরের প্রথম দিকে ফেলবারস্যাম জেলখানা থেকে পালিয়ে যায় সে।'

ম্যানফ্রেড মাথা ঝাঁকালেন। 'সত্যি কথা বলতে কি, খবরটা শোনার পর আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। কেইনকে কখনোই আমার দুরন্ত বলে মনে হয়নি।'

'গত আগস্টে তাকে মস্কোয় দেখা গেছে।'

বিস্ময়ে বোবা বনে গেলেন ম্যানফ্রেড। তারপর অস্ফুটে বললেন, 'মাই গড!' পরমুহূর্তে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল তাঁর। 'আপনি জানলেন কিভাবে?'

উত্তর না দিয়ে একের পর এক আরো কয়েকটা প্রশ্ন করলো

রানা, 'বব হাডসন, যাকে আপনারা ডাবল এজেন্ট বলে সন্দেহ করছিলেন, হঠাৎ বাতাসে মিলিয়ে গেল—জানেন, এখন সে কোথায়? পার্লামেন্ট এম. পি., স্যার হামফ্রে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের গোপন ডকুমেন্টসহ নিখোঁজ হয়েছেন—জানেন, এখন তিনি কোথায়? অ্যাডমিরাল টয়েনবি, জাহাজ থেকে ইংলিশ চ্যানেলে পড়ে হারিয়ে গেলেন, কিন্তু তাঁর লাশ পাওয়া গেল না—জানেন, তারপরও তাঁকে দেখা গেছে?'

'কো-কোথায়?'

'হাডসনকে বার্লিনের পুব দিকে, স্যার হামফ্রেকে তেল আবিবে, আর টয়েনবিকে ইরানে।'

রানার ওপর যেন রেগে উঠলেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস চীফ। 'ব্যাপারটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না, মিঃ রানা। যে চারজনের কথা বলছেন তাদের আমরা অনেক খুঁজেও কোনো হদিশ করতে পারিনি। আর আপনি মাত্র তিন দিন হলো লণ্ডনে এসে···।'

'তিন দিন নয়, তিন মাস আগে থেকেই এ-সব তথ্য জানি আমরা, মিঃ ম্যানফ্রেড,' বি-এস-এস চীফকে বাধা দিয়ে বললো রানা।

'তিন মাস আগে থেকে জানেন?' এবার পরিষ্কার বোঝা গেল ম্যানফ্রেড রেগে গেছেন। 'আমাদের তাহলে জানাননি কেন?'

বিনয়ের সাথে হাসলো রানা। 'সেরকম কোনো চুক্তি আছে বুঝি—আমরা যা জানবো সব আপনাদের জানাতে হবে?'

যেন একটা পাথুরে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে থমকে গেলেন ম্যানফ্রেড। পরমুহূর্তে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। 'এখন তাহলে জানাবার গরজ অনুভব করছেন কি কারণে?'

'আমাদেরও লেজে পা পড়েছে, তাই,' বললো রানা। 'ব্যাপারটা এখন আর কাউন্ট বনাম স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড নেই। র‍্যাম এজেন্সিও জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু বিদেশের মাটিতে রয়েছি আমরা, আমাদের সাহায্য দরকার। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড নই পারলে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস সাহায্য করতে পারবে। তথ্যগুলো জানাবার কারণ, আপনারা বুঝুন, আপনাদের চেয়ে এগিয়ে আছি আমরা—কাজেই তদন্তের ভার আমাদের হাতেই থাকা দরকার।'

কথাগুলো নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করলেন ম্যানফ্রেড। আঙুলের ফাঁকে ধরা সিগারেটের দিকে একদৃষ্টে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলেন। রানা তাঁর পাকা ভুরু কুঁচকে থাকতে দেখলো। তারপর মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন তিনি, 'যে চারজনের কথা বললেন আপনি, আপনার ধারণা কাউন্টই ওদেরকে ইংল্যাণ্ড থেকে বের করে নিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, এ শুধু আমার ধারণা,' বললো রানা। 'তবে এ লাইনে কাউন্টের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী আছে বলে তো শুনিনি।'

আবার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর ম্যানফ্রেড বললেন, 'কাউন্ট লোকটা কি রাশিয়ান স্পাই, আপনার কি মনে হয়?'

'আমার তা মনে হয় না। টাকার কাঙাল, এটুকু বলতে পারি। শুধু মোটা অংকের দিকে হাত বাড়ায়। লোভী এক

ব্যবসায়ী, যার নীতির কোনো বালাই নেই।'

'তার সম্পর্কে গুজবগুলো আপনারও নিশ্চয় কানে গেছে··· ।'

'গুজব তো অনেকগুলো, কোন্‌টার কথা বলছেন আপনি? ভারতীয় মহারাজা? মিশরীয় মাস্টার ক্রিমিনাল?'

'না, ওই যে সেটা—কাউন্টের নাকি কোনো অস্তিত্বই নেই, আছে একটা অত্যাধুনিক কমপিউটর, অনেকটা নাকি মানুষের মতোই দেখতে··· ?' হাঁ হয়ে গেছে রানা, ওর চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ লক্ষ্য করে ম্যানফ্রেড চুপ করে গেলেন।

'এটা এই প্রথম শুনলাম,' শান্ত গলায় বললো রানা, কিন্তু গম্ভীর। ম্যানফ্রেড বুঝতে পারলেন, ভেতরে ভেতরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে রানা। 'সত্যি কথা বলতে কি, ধারণাটার মধ্যে চিন্তার খোরাক আছে। রোবট, তাই না?' হঠাৎ মুখ তুলে তাকালো ও। 'না, মিঃ ম্যানফ্রেড, গুজবটা আমি হেসে উড়িয়ে দিতে পারি না।'

'কারণ?'

বিষাদের সাথে তিক্ততা মেশানো ক্ষীণ একটু হাসলো রানা। "কোনো প্রশ্ন করবেন না, প্লিজ। আপাততঃ শুধু এইটুকু বলতে পারি, কাউন্টের কাজের প্যাটার্ন দেখে আমার পরিচিত একজন লোকের কথা মনে পড়ে যায়। লোকটা বেঁচে থাকলে আরো অনেক ক্রাইম করতো।'

'জানতে পারি, কে ছিলো সে? নাকি অনধিকার চর্চা হয়ে যায়?'

'কে. সি.—নাম শোনেননি? প্রতিভাবান বিজ্ঞানী, কিন্তু

মিস-গাইডেড। জগত এবং মানুষের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেছিল, কিন্তু তার কর্মপদ্ধতি ছিলো সর্বনাশা, ফলে অমঙ্গলের প্রতীক হয়ে ওঠে লোকটা।'

'আমেরিকার ওপর খুব খ্যাপা ছিলো, তাই না? কবীর চৌধুরী?'

'হ্যাঁ।'

'কিছু কিছু জানি বটে তার সম্পর্কে। লোকটা মারা গেছে, বলছেন? এমনও তো হতে পারে যে···।'

'না, পারে না,' বললো রানা। 'আমি তাকে ডুবে মরতে দেখেছি। হাঙরের দল তাকে ছিঁড়ে ফেলে।'

'মারা যাবার পর শুধু হিরোরাই ফিরে আসবে, এর কোনো মানে নেই, মিঃ রানা,' রসিকতা করে বললেন ম্যানফ্রেড। নাম উচ্চারণ না করলেও রানা বুঝলো, শার্লক হোমস প্রসঙ্গ টানলেন বি-এস-এস চীফ। 'ভিলেনরাও তো দু'একজন ফিরে আসতে পারে?'

রানা কোনো মন্তব্য করলো না।

ম্যানফ্রেডও প্রসঙ্গ বদল করলেন, 'বদরুল হাসানের ভাগ্যে কি ঘটেছে বলে আপনার ধারণা?'

'সেটা জানবো বলেই তো কেসটার দায়িত্ব নিচ্ছি,' বললো রানা। এক সেকেণ্ড চোখ বুঁজে থাকলো ও। মনে একটা প্রশ্ন জাগলো, হাসান কি বেঁচে আছে?

ফোল্ডারে টোকা দিয়ে ম্যানফ্রেড বললেন, 'রিপোর্টটা পড়েছি। আপনার প্ল্যানটা ভালোই বলতে হবে। জো সলোমনের সাথে

একই সেলে থাকতে চান আপনি।'

সামান্য একটু সামনে ঝুঁকলো রানা। 'ব্যবস্থা করা সম্ভব, মিঃ ম্যানফ্রেড?'

'তা সম্ভব,' বললেন ম্যানফ্রেড। 'কিন্তু ঝুঁকির কথা ভেবে দেখেছেন? আপনিও কিন্তু মিঃ হাসানের মতো একই ঝুঁকি নিতে চাইছেন।'

'জানি,' বললো রানা। 'কিন্তু আর কোনো বিকল্প আছে কি? সূত্র পাবার একমাত্র পথ, কাউন্টের সম্ভাব্য মকেলের সাথে আঠার মতো সেঁটে থাকা।'

মাথা ঝাঁকালেন ম্যানফ্রেড। 'হ্যাঁ, সলোমনের সাথে একই সেলে থাকতে হবে আপনাকে। হোম অফিস সরাসরি প্রিজন গভর্ণরের সাথে কথা বলে সে-ব্যবস্থা করতে পারবে। গভর্ণর ব্যাপারটা পছন্দ না-ও করতে পারেন, কিন্তু তাঁকে যা বলা হবে তা তিনি করতে বাধ্য। একমাত্র তিনিই জানবেন। আপনার পরিচয়, ইতিহাস, ইত্যাদি কি হবে?'

'কাগজ-পত্র সব তৈরি করা হয়েছে—অবশ্যই জাল। আমি একজন আফগান, নাম নাহিদ শাহ, নাগরিকত্ব পেয়েছি তিন বছর, ইংল্যাণ্ডে আছি সাত বছর।'

'ভাবছি, শুধু শুধু সময়ের অপচয় হচ্ছে না তো? যুক্তিতে আসে বটে এরপর সলোমনকেই জেল থেকে বের করা হবে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না।'

রানা মাথা নাড়লো। 'স্ট্রোকটা খুব সন্দেহজনক, যাই বলুন। আগের কোনো রেকর্ড নেই, স্বাস্থ্যটাও দারুণ ভালো।'

'কিন্তু রিপোর্টে বলা হয়েছে ওটা জেনুইন অ্যাটাক ছিলো।'

'জানি মিঃ জ্যাক মারভিন আপনাকে বলেছেন, ড্রাগের সাহায্যে কৃত্রিম স্ট্রোকের ঘটনা ঘটানো যায় না।'

'তার ধারণা ভুল?'

'আমি বলবো, সমস্ত তথ্য তাঁর জানা নেই। অফিশিয়ালি কোনো ড্রাগ সত্যি নেই, কিন্তু প্রায় বছরখানেক হলো হল্যাণ্ডে এ-ধরনের একটা ড্রাগ নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট চলছে। ওষুধটার নাম মাবোফাইন। ইনসুলিন আর শক ট্রিটমেণ্টের যে ক্ষমতা, এটারও সেই একই ক্ষমতা—ব্রেনের ওয়েভ প্যাটার্নে গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারে। ওষুধটা মানসিক রোগীদের ওপর ব্যবহার করা যাবে বলে আশা করছে ওরা।'

'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন, সলোমনকে জেল থেকে বের করার অপারেশন এরি মধ্যে শুরু হয়ে গেছে?'

'অপারেশন শুরু হয়নি, প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।'

'যদি এমন হয়, প্রস্তুতি শেষ করতে এক বছর বা ছ'মাস সময় নিলো ওরা?' জিজ্ঞেস করলেন ম্যানফ্রেড। 'হার ম্যাজেস্টি-র অতিথি হিসেবে এতোদিন থাকতে পারবেন? আর সব কাজ বাদ দিয়ে?'

'মনে আছে, বলেছি, আপনাদের সাহায্য লাগবে আমার?'

ম্যানফ্রেড মাথা ঝাঁকালেন।

'একটা ডাকাতি করে ধরা পড়বো আমি,' বললো রানা। 'বিচারে আমার জেল হবে। ফ্রাইডেথর্প কারাগারে নয়, অন্য কোথাও রাখা হবে আমাকে—কাগজে কলমে। আসলে আমি

জেলের বাইরে থাকবো। ওদিকে ফ্রাইডেথর্পে থাকবে সলোমন, কিন্তু আমাদের লোকজন তার ওপর নজর রাখবে। কাউন্টের লোকেরা যোগাযোগ করলে নিশ্চয়ই তার ব্যবহারে কিছু পরিবর্তন আসবে, আমার লোকেরা ধরতে পারবে সেটা। তখনই হোম অফিস ফ্রাইডেথর্পে পাঠাবে আমাকে, সলোমনের সাথে একই সেলে থাকবো আমি। এবার বুঝতে পারছেন, কোথায় আপনার সাহায্য দরকার আমার?'

চিন্তিত হলেন ম্যানফ্রেড। 'এতো সব আয়োজন করা সম্ভব নয় তা বলছি না, তবে হোম অফিসকে রাজি করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'ঠিক আছে, এদিকটা দেখবো আমি। কিন্তু আপনি বললেন, ডাকাতি করে ধরা পড়বেন—অতো ঝামেলার মধ্যে গিয়ে দরকার কি? হোম অফিস ইচ্ছে করলে এমনিতেই ভুয়া কয়েদী হিসেবে দেখাতে পারে আপনাকে যদি···।'

একটা হাত তুলে ম্যানফ্রেডকে বাধা দিলো রানা। ডেস্কের ওপর পড়ে থাকা জো সলোমনের ডোশিয়ে-র দিকে তাকালো ও। 'ওটা পড়েও লোকটা সম্পর্কে কিছু বোঝেননি? ফটোর দিকে আরেকবার তাকান, চোখ দুটো দেখুন। খবরের কাগজে কি লিখেছে সে-সব ভুলে যান। প্রাক্তন বীরযোদ্ধা, আধুনিক রবিন হুড—ঘোড়ার ডিম! আমার চোখে লোকটা স্রেফ একটা নির্ভুর কসাই, এক প্যাকেট সিগারেটের জন্যে প্রিয় বন্ধুকেও হাসতে হাসতে খুন করতে পারে। তার সেলে আমি থাকবো শুনলেই আমার সম্পর্কে সব জানার চেষ্টা করবে সে। জেল-

খানায় নিশ্চয়ই তার লোক আছে। আমি আসলে ডাকাতি না করেই জেল খাটছি এটা জানতে এক হপ্তার বেশি লাগবে না তার। জেলখানা ভয়ংকর জায়গা, অদ্ভুত সব দুর্ঘটনায় প্রায়ই মারা যাচ্ছে কয়েদীরা—তালিকায় আমার নামটা যোগ হতে অসুবিধে কি?'

'যুক্তির কথা,' মেনে নিয়ে বললেন ম্যানফ্রেড। 'বেশ, তাই হোক তাহলে। কিন্তু তারপর? একই সেলে দু'জন থাকলেন। কাউন্টের লোকেরা সলোমনকে জেল থেকে বের করে নিয়ে যেতে এলো। আপনি কি করবেন?'

'চেষ্টা করবো যাতে আমাকেও ওরা নিয়ে যায়,' বললো রানা।

'ভাবছেন এভাবে আপনি কাউন্টের কাছে পৌঁছুতে পারবেন?'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'হাসানের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা-ও আমাকে জানতে হবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ছোট্ট একটা প্রশ্ন করলেন ম্যানফ্রেড, 'কোথায় ডাকাতি করবেন ভেবেছেন কিছু?'

'রুথম্যান মেটাল ইণ্ডাস্ট্রি-তে।'

'ডাকাতি করার পর পালিয়ে না গিয়ে ধরা পড়তে হবে আপনাকে।'

হেসে ফেললো রানা। 'নির্ভর করছে টাকার পরিমাণের ওপর। টাকা খুব বেশি হলে···।'

'সম্ভবত অজ্ঞাতনামা এক লোক ফোন করে পুলিশকে জানাবে কোথায় পাওয়া যাবে আপনাকে, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালো রানা।

'আমি আপনার সাফল্য কামনা করি, মিঃ রানা।'

'ধন্যবাদ, মিঃ ম্যানফ্রেড,' বললো রানা, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ও। 'কিন্তু দুঃখিত, আপনি কোনো শেয়ার পাবেন না!'

হো হো করে হেসে উঠলেন ম্যানফ্রেড। যুবকটিকে তাঁর ভাল লাগলো।

ছয়

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলো গার্ড, গেট হাউসের দিকে দু'পা এগোলো। সেই ভোর অন্ধকার থেকে ডিউটি দিচ্ছে সে, পেশীগুলো আড়ষ্ট হয়ে গেছে। তবে পালাবদলের সময় হয়ে এসেছে, মাত্র দশ মিনিট বাকি। ঘুরলো সে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে লাল একটা ওয়ার্কস ভ্যান খ্যাপা ষাঁড়ের মতো বেরিয়ে এলো গ্যারেজ থেকে। উঠনের ওপর দিয়ে সগর্জনে এদিকেই আসছে।

আঁতকে উঠে সামনে লাফ দিলো গার্ড। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলো ভ্যান, কংক্রিটে পিছলে গেল চাকা, খানিকটা এগিয়ে এসে ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। বনেটের কাছ থেকে সুইং বার মাত্র এক গজ দূরে। ভ্যানের ক্যাব থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো এক তরুণ। এলোমেলো পা ফেলে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করলো সে, মুখে তাজা রক্ত লেগে রয়েছে। তাল হারিয়ে ফেললো সে, ভাঁজ হয়ে গেল একটা হাঁটু। ছুটে এসে তাকে

ধরে ফেললো গার্ড। তরুণকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করছে সে, গেট হাউস থেকে তার অপর তিন সঙ্গী বেরিয়ে এলো।

তরুণ ড্রাইভার আতংকিত, কথা বলার শক্তি পাচ্ছে না। গার্ডদের একজন তার কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকি দিলো বার কয়েক। চারজনই একসাথে কথা বলছে। কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারলো না তরুণ। ঘন ঘন ঢোক গিললো সে, আকাশের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়লো, তারপর অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গিতে একটা হাত লম্বা করে দিয়ে মেইন বিল্ডিঙের দিকটা দেখালো ওদের। 'ওয়েজ অফিস!' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো সে। 'সর্বনাশ হয়ে গেছে!'

ঝট করে বিল্ডিঙের দিকে তাকালো গার্ডরা।

নিস্তেজ হয়ে ওদের হাত থেকে খসে পড়তে শুরু করলো তরুণ। খপ্ করে তাকে আবার ধরে ফেললো গেট গার্ড। 'ছুটে দেখো গিয়ে কি হচ্ছে ওখানে!' সঙ্গীদের বললো সে। 'একে আমি ভেতরে নিয়ে গিয়ে পুলিশে ফোন করি।'

উঠন ধরে ছুটলো তিনজন। পিছু নিলো অ্যালসেশিয়ানটা। গেট গার্ড আরো শক্ত করে ধরলো তরুণ ড্রাইভারের কাঁধ, বললো, 'তোমার অবস্থা ভালো নয়। এসো, ভেতরে বসবে চলো।'

ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে ড্রাইভার, মাথা ঝাঁকিয়ে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখের রক্ত মুছলো। গার্ডের গায়ে হেলান দিয়ে গেটহাউসে ঢুকলো সে।

গেটহাউসে ঢোকার পর কি ঘটেছে তা আর পরে সঠিক মনে

করতে পারেনি গার্ড। তরুণকে একটা চেয়ারে বসিয়ে ডেস্কের দিকে এগোয় সে। কোনো শব্দই তার কানে ঢোকেনি। টেলিফোনের দিকে হাত বাড়িয়েছে, এই সময় খুলির গোড়ায় গর্দানে প্রচণ্ড এক রদ্দা খায় সে। ছিটকে পড়ে যায় মেঝেতে।

সাথে সাথে জ্ঞান হারায়নি গার্ড, তবে তার বোধশক্তি ভোঁতা হয়ে যায়, চোখে অন্ধকার দেখতে থাকে। একবার একটা আওয়াজ শুনতে পায় সে, মনে হয় সুইং বারটা সরানো হলো। তারপর ভ্যানের শব্দ পায়। শব্দটা ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যেতে থাকে। এরপর জ্ঞান হারায় গার্ড।

লণ্ডনের নির্জন পপলার এলাকা, আবাসিক এলাকা হলেও বাড়িঘর এদিকে খুবই কম। সাদা একটা ভ্যান-গাড়ি বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়লো সরু গলিতে। এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে আছে ড্রাইভার, জানালা দিয়ে মুখ বের করে বাড়িগুলো দেখছে। ছোটো একটা দোতালা বাড়ির নম্বর দেখে তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। খোলা গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলো ভ্যান। উঠনের এক ধারে গ্যারেজ, সেটারও গেট খোলা।

গ্যারেজে ভ্যান রেখে সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠলো তরুণ ড্রাইভার। সিঁড়ির মাথায় দরজাটা বন্ধ। কলিংবেল বাজালো সে।

দরজা খুললো না। আবার কলিং বেল বাজাতে যাবে, এই সময় ভেতর থেকে খসখসে একটা আওয়াজ ভেসে এলো। পরমুহূর্তে খুলে গেল দরজা।

দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে অপরূপ সুন্দরী এক যুবতী। যুবতীর পরনে সাদা সিল্ক-ঘাগরা, ঝলমলে জরির কাজ করা গাঢ় নীল ব্লাউজ। ওড়নাটা হালকা নীল, মাথা ঢাকা দিয়ে ঝুলে আছে মুখের দু'পাশে। যুবতীর রাঙা ঠোঁটে মিষ্টি-মধুর হাসি, চোখে কৌতুক, দৃষ্টিতে উষ্ণ আমন্ত্রণ।

মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলো রানা। ওর চোখে পলক পড়ছে না।

'কাকে চাই?' যুবতী প্রশ্ন করলো, কণ্ঠ নয় যেন সুর-ঝংকার।

'এই, মানে,' আমতা আমতা করে বললো রানা, 'এটা তো সাতাশ নম্বর বাড়ি, তাই না?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ,' আগন্তুক আড়ষ্টবোধ করছে বুঝতে পেরে উৎসাহ দিলো যুবতী, অভয় দিয়ে হাসলো আবার। 'বলুন কি চাই আপনার?'

তবু ইতস্তত করতে লাগলো রানা। 'মানে, যাকে আমার দরকার তাকেই বলবো··· এখানে একজন আফগান ভদ্রমহিলার থাকার কথা, ঠিক বুঝতে পারছি না আপনিই তিনি কিনা··· আপনার নামটা জানাবেন কি, প্লিজ?'

'পিয়াসী গুলনার,' বললো যুবতী।

রানার চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। 'তাহলে তো আপনিই! আপনার কাছেই এসেছি আমি। আমি···আমি নাহিদ শাহ!'

'ও,' গোলাপি ঠোঁট জোড়া গোল করে তুলে মধুর কটাক্ষ হানলো পিয়াসী গুলনার, 'আপনিই তাহলে নাহিদ শাহ! আগে

বলেননি কেন। আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন—আমি তো যুগ যুগ ধরে আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালো পিয়াসী, সসংকোচে ভেতরে ঢুকলো রানা। 'আপনি কি একা··· ?'

'না।' জলতরঙ্গের শব্দ তুলে হাসলো পিয়াসী। 'ফ্ল্যাটে আরো একজন রয়েছেন—আপনি!' ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে একবার তাকালো সে। 'দরজাটা বন্ধ করে দিন, প্লিজ।'

দরজা বন্ধ করে ঘুরলো রানা। সাজানো একটা ড্রইংরুমে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। আরেক দরজা দিয়ে ভেতরের একটা কামরায় চলে যাচ্ছে পিয়াসী, দোরগোড়া থেকে পিছন দিকে একবার তাকিয়ে ডাকলো, 'এদিকে।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগোলো রানা। ড্রইংরুম থেকে চলে এলো বেডরুমে। অত্যন্ত রুচিসম্মত এবং বিলাসবহুল আসবাব দিয়ে সাজানো হয়েছে কামরাটা। জানালায় দামী পর্দা। মেঝেতে পুরু কার্পেট। ফোমের বিশাল বিছানায় মখমলের চাদর। চারটে বালিশ। বেশ বড়সড় কামরা, বিছানার উল্টোদিকে একটা সোফা সেট। ইঙ্গিতে সেদিকটা দেখিয়ে পিয়াসী রানাকে বললো, 'বসুন, মিঃ নাহিদ। তারপর বলুন, ঠাণ্ডা নাকি গরম? আপনার জন্যে সব ব্যবস্থাই করা আছে।'

'এক কাপ গরম কফি হলে ভালো হয়।'

নিচু তেপায়ের দিকে ইঙ্গিত করলো আফগান সুন্দরী। তেপায়ে একটা ফ্লাস্ক আর দুটো কাপ রয়েছে। 'হেলপ ইওর-সেলফ, মিঃ নাহিদ।'

নিজের কাপে কফি ঢাললো রানা, তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি ?'

'ধন্যবাদ, এইমাত্র খেয়েছি,' বললো পিয়াসী। 'এবার বলুন, আপনার মুখে কি ওটা—রক্ত ?' রানার মুখোমুখি একটা সোফায় বসলো সে।

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখের দাগটা মুছলো রানা। 'হ্যাঁ-না, একেবারে অন্য জিনিস।'

'ভেতরে ঢুকতে পেরেছিলেন ?'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'দেখতেই পাচ্ছেন, বেরিয়েও আসতে পেরেছি।'

পিয়াসীর চোখ জোড়া বিস্ফোরিত হয়ে উঠলো। 'টাকা নিয়ে ?'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'আজ সকালে যে পুরনো ফোর্ড ভ্যানটা কিনেছি তাতে আছে।'

'ভ্যানটা ?'

'নিচের গ্যারেজে।'

'আইনও বোধহয় খুব বেশি পিছিয়ে নেই, কি বলেন ? এলো বলে, তাই না ?'

সোফা ছেড়ে পকেট থেকে রুমাল বের করলো রানা, জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ঘাড় মুছতে মুছতে নিচের রাস্তায় তাকালো ও। 'মনে হয় না। টেমসের ওপারে গাড়ি বদল করে এসেছি। সত্যি কথা বলতে কি, শুধু যদি একটা মুখোশ ব্যবহার করতাম, পুলিশের কোনো উপায় ছিলো না খুঁজে বের করে

আমাকে।'

'বিপজ্জনক কথাবার্তা।' ওড়নাটা ভালো করে মাথায় জড়ালো পিয়াসী। 'সিরিয়াসলি জিজ্ঞেস করছি, ব্যাপারটা আপনি ম্যানেজ করলেন কিভাবে?'

'সব বলে দিলে কাগজ পড়ে মজা পাবেন না।'

পিয়াসী হাসলো। 'আপনি আমাকে তুমি বললেও পারেন— আমি কিছু মনে করবো না।'

'আমার সৌভাগ্য,' জানালার দিকে পিছন ফিরলো রানা, সারা মুখে শয়তানী হাসি।

'এবার তাহলে যাই,' সোফা ছেড়ে উঠলো পিয়াসী, 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ফোনটা করে আসি।'

চেহারায় আবেদন নিয়ে তাকালো রানা। 'প্লিজ, আরেকটু সময় দিন।' ফিরে এসে সোফায় বসলো ও। ফ্লাস্ক থেকে কাপে কফি ঢাললো আবার। 'একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবেন না।'

'না, কি মনে করবো!' পিয়াসী মুক্তোর মতো দাঁত বের করে মৃদু হাসলো। তার চোখে ঝিক্ করে উঠলো কৌতূহল। ধীরে-ধীরে আবার সোফায় বসলো সে।

'আপনি না, মানে তুমি না···।'

'জানি,' বললো পিয়াসী, মুচকি হাসলো, তারপর হাতচাপা দিলো ঠোঁটে। 'আমি খুব সুন্দরী।'

'বুঝলাম সব পুরুষই এই কথাটা তোমাকে বলে, শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে তোমার।' রানা গম্ভীর।

'কিন্তু কথাটা সত্যি—তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে খুব কমই দেখেছি আমি।'

'কথাটা বোধহয় সব মেয়েকেই বলা হয়, তাই না?' রানাকে খোঁচা মেরে আনন্দ পাচ্ছে মেয়েটা।

'তুমি আমাকে অপমান করছো!' শিড়দাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার।

'অপমান বোধ করায় প্রমাণ হয়ে গেল অভিযোগ মিথ্যে নয়!' পিয়াসী শব্দ করে হেসে উঠলো। আবার দাঁড়ালো সে।

'কি হলো?'

'ফোন করতে হবে না?'

কাতর চোখে তাকালো রানা। 'এখুনি না করলেই নয়?'

'কেন?' জিজ্ঞেস করলো পিয়াসী। 'কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ, মানে, যদি অনুমতি পাই।'

দাঁড়িয়ে থেকেই মেয়েটা বললো, 'বলুন, অনুমতি দিলাম।'

'আপনাকে না—মানে, তোমাকে না আমি···।'

'জানি। ভালোবেসে ফেলেছেন।'

'যুগ-যুগান্ত ধরে শুধু তোমাকেই আমি স্বপ্নে···।'

রানার সামনে দিয়ে এগোলো আফগান সুন্দরী। খপ করে রানা তার একটা হাত ধরে ফেললো।

'আহ্ ছাড়ো, কী অসভ্যতা করছো!' বললো বটে, কিন্তু হাতটা ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে তেমন জোর খাটালো না।

করুণ আবেদনের দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকালো রানা। 'তোমার বদলে এখানে কোনো পুরুষমানুষ বা কোনো অসুন্দরী

থাকলে সমস্যাটা দেখা দিতো না, পিয়াসী। ভেবে দেখো, কতো দিনের জন্যে বন্দী জীবন কাটাতে হবে আমাকে। আবার কবে বেরুতে পারবো জানি না। তুমি আমার মানসপ্রিয়া, বিদায় মুহূর্তে মনে রাখার মতো কিছু একটা দেবে না—তা যদি মধুর কোনো স্মৃতি হয়, জেলখানায় বসে স্মরণ করে পুলকিত হবো।'

'ইস, কি আবদার!' রানার মাথার দু'পাশে হাত রেখে কাছে টানলো পিয়াসী, মাত্র একবার চুমো খেলো ঠোঁটে, তারপর ছেড়ে দিলো। 'আপাততঃ এর বেশি কিছু দেয়া গেল না। বাকি ভালোবাসাটুকু কবিতা, চাঁদ, আর ফুলের কাছে গচ্ছিত রাখলাম। আবার তুমি ফিরে এলে···।'

'যদি কখনো ফিরে না আসি?'

তাড়াতাড়ি রানার মুখে হাতচাপা দিলো পিয়াসী। 'অমন অলক্ষুণে কথা মুখে আনবে না!'

ইঙ্গিতে বিছানাটা দেখালো রানা। 'খানিকটা সময় ওখানে কাটাবার কোনো উপায়ই তাহলে নেই? তোমার সিদ্ধান্তে তুমি অটল?'

চোখ ভিজে গেছে সোহানার। 'পাগলামি করে না, লক্ষ্মীটি!' জোর করে হাসলো সে। পরমুহূর্তে অস্থিরভাবে রানার মাথাটা বুকের মাঝখানে চেপে ধরলো। 'মিঃ ম্যানফ্রেড ব্যবস্থা করতে পারলে ভিজিটিং ডে-তে তোমাকে আমি দেখে আসবো।'

হঠাৎ রানাকে ছেড়ে দিয়ে দরজার দিকে এগোলো সোহানা। সোফা ছেড়ে উঠলো রানা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ থেকে

লিপস্টিকের দাগ মুছলো। তারপর বন্ধ করে দিলো দরজা।

এখন ওর আর কিছু করার নেই, ওদের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া। বালিশের নিচে রিভলভারটা রেখে জানালার ধারে, বিছানার ওপর বসলো ও। নিচের রাস্তাটা দেখলো কিছুক্ষণ। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে মাথা রাখলো বালিশে।

বিশ মিনিটও পেরোয়নি গাড়ির আওয়াজ পেলো রানা। শুয়েই থাকলো ও, জানালা দিয়ে উঁকি দিলো না। তারপর আর কোনো শব্দ নেই। ত্রিশ সেকেণ্ড পর বিছানা থেকে নেমে ড্রইংরুমে চলে এলো ও।

আরো ত্রিশ সেকেণ্ড পর ড্রইংরুমের বাইরে, সিঁড়ির ল্যাণ্ডিঙে নড়াচড়ার অস্পষ্ট আওয়াজ হলো। দরজায় নক হলো মৃদু। মিসেস বাটার, বাড়িওয়ালি, বেসুরো কিন্তু আদুরে গলায় ডাকলো, 'ভেতরে আছেন নাকি, মিঃ শাহ?'

সাথে সাথে নয়, তিন সেকেণ্ড পর বিরক্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো রানা, 'কি চাই আপনার?'

'আপনার একটা চিঠি আছে। আপনি যখন বাইরে ছিলেন তখন এসেছে।'

'একটু অপেক্ষা করুন।'

গভীর একটা শ্বাস টানলো রানা, শক্ত করে নিলো পেশী। তারপর তালা খুললো দরজার। শরীরের ওপর বিস্ফোরিত হলো ভারি কবাট, স্রোতে পড়া খড়কুটোর মতো ভেসে গেল রানা। শুধু কবাটের ধাক্কা নয়, ওকে ঠেলে নিয়ে এলো প্রকাণ্ডদেহী

চারজন পুলিশ। পাঁচজন একযোগে আছাড় খেলো একটা লম্বা সোফার ওপর, সোফাটা সরব প্রতিবাদের সাথে ভেঙে গেল।

ধস্তাধস্তির ভান করতে হলো রানাকে। তবে বেশিক্ষণ নয়, একটু পরই ওর হাতে হাতকড়া পড়লো। হ্যাঁচকা টান দিয়ে দাঁড় করানো হলো ওকে।

তাল গাছের মতো লম্বা, হাসিখুশি চেহারার এক লোককে দেখা গেল দোরগোড়ায়। ভেতরে ঢোকার আগে চৌকস ভঙ্গিতে একটা সিগারেট ধরালো সে। সাদা পোশাকে জাঁদরেল অফিসার। পরনে গ্যাবার্ডিন রেনকোট। ভেতরে ঢুকে রানার সামনে দাঁড়ালো সে। আপাদমস্তক দেখলো ওকে। তারপর হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো এদিক ওদিক। বললো, 'বিদেশ-বিভুঁইয়ে এসে এরকম বোকামি করার কোনো মানে হয়? দেশী কাঙাল ভাত পায় না, আর তুমি কিনা···' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো সে, তারপর সরাসরি জিজ্ঞেস করলো, 'লক্ষ্মী ভাই, চটপট বলো দেখি, কোথায় রেখেছো টাকাগুলো?'

'এগারো তলার ছাদে উঠে নিচে লাফ মারছো না কেন?'

'লণ্ডনে অনেক দিন আছো। শুধু ডাকাতি নয়, চ্যাটাং চ্যাটাং কথাও শিখেছো। শুধু শেখোনি কি রকম মেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব করতে হয়। দিলো তো ফাঁসিয়ে!'

আক্রোশে রানার গাল ফুলে উঠলো। মনে মনে একটা কথা ভেবে একটু দুঃখই হলো ওর, যারা অস্কার দেয় এক্সপ্রেশনটা তাদের দেখানো গেল না। 'কি বললে! কে ফাঁসিয়ে দিয়েছে?'

'একটা অজ্ঞাতনামা মেয়ে। থানায় টেলিফোন করেছিল

অফিসারের চোখে সহানুভূতি। 'কিন্তু টাকাটা কোথায় তা সে জানে না। বা জানলেও বলেনি। কোথায়, মিঃ শাহ?'

দুপদাপ পায়ের শব্দ হলো সিঁড়িতে, ঝড়ের বেগে একজন কনস্টেবল ঢুকলো ড্রইংরুমে। 'টাকা পাওয়া গেছে, ইন্সপেক্টর,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো সে। 'একটা ফোর্ড ভ্যানের ভেতর!'

রানার দিকে ফিরলো ইন্সপেক্টর, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'পৌনে দু'লাখ পাউণ্ড, কি উপকারে লাগলো?'

'পরে জানাবো,' বললো রানা। 'চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে হবে।'

'সেজন্যে প্রচুর সময় পাবে তুমি, আন্দাজে ভুল না হলে অন্তত সাত বছর।' কনস্টেবলদের দিকে তাকালো অফিসার। 'দেরি কিসের? এখান থেকে নিয়ে যাও ওকে।'

সবিনয়ে হাসলো রানা। 'কোর্টে আবার দেখা হবে, ইন্স-পেক্টর।'

সাত

ফ্রাইডেথর্প জেলখানার গভর্ণর কলম নামিয়ে রেখে ডেস্ক ল্যাম্প জ্বাললেন। আটটা বেজে কয়েক মিনিট, দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিক। বাঁ হাত মুখের কাছে তুলে সিগারেটে টান দিলেন তিনি, তারপর ছাইদানিতে ফেলে নেভালেন সেটাকে। চেয়ার ছেড়ে উঠে চলে এলেন জানালার সামনে। উপত্যকার শেষ মাথায় সার সার উঁচু পাহাড়, দিনশেষের রাঙা আলো পড়ায় চূড়াগুলো মশালের মতো জ্বলছে।

পিছনে, দরজায় নক হলো। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন গভর্ণর। প্রিন্সিপাল অফিসার ডানিয়েল বুকার ঢুকলো ভেতরে, তার হাতে একটা বড়সড় এনভেলাপ। প্রিজন অফিসার কি বলতে এসেছে আন্দাজ করতে পারলেন গভর্ণর। জানালার কাছ থেকে সরে এসে আবার তিনি বসলেন ডেস্কের পিছনের চেয়ারটায়। 'তোমার হাতে কি ওটা, বুকার?'

—'বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, স্যার,' বললো ডানিয়েল

বুকার। 'আমাদের নতুন কয়েদী নাহিদ শাহ পৌঁচেছে—বলে-ছিলেন, লোকটা এলে আপনি ব্যক্তিগতভাবে একবার তাকে দেখতে চান।'

'বলেছিলাম নাকি? বলতে পারি। সে কি বাইরে?'

মাথা ঝাঁকালো ডানিয়েল বুকার। 'জ্বী, স্যার। ডাকবো?'

'কি রকম লোক সে?'

কাঁধ ঝাঁকালো প্রিন্সিপাল অফিসার। 'আমি বলবো বিপথ-গামী ভদ্রলোক। এনভেলাপ খুলে গভর্ণরের সামনে ডকুমেণ্ট-গুলো রাখলো সে। 'কেসটার কথা আপনার মনে থাকতে পারে, স্যার। সে-সময় সব ক'টা কাগজে খবর বেরিয়েছিল। পৌনে দু'লাখ পাউণ্ড ডাকাতি করে প্রায় পালিয়েই গিয়েছিল বলা চলে।'

'যতো দূর মনে পড়ছে, অজ্ঞাতনামার ফোনকল পেয়ে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।'

'জ্বী, স্যার, তাই। আফগানরা এমনিতে খুব হাসিখুশি আর ভদ্রলোক, নাদির শাহ বরং আরো এক কাঠি বাড়া। শান্তশিষ্ট, বিনয়ের অবতার। এই লোক যে কি করে ডাকাত হলো মাথায় আসে না।'

'কোথায় যেন করেছিল ডাকাতিটা?'

'রুথম্যান মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিতে,' বললো বুকার। 'এটাই তার প্রথম ক্রাইম নয় অবশ্য। এঞ্জিনিয়ার, অথচ এক সময় ভাড়াটে সৈনিক হিসেবেও কাজ করেছে—সালভাদরে, ইয়ামেনে। ইং-ল্যাণ্ডে আছে অনেক বছর, নাগরিকত্ব পেয়েছে তিন বছর আগে।

মাঝখানে বেশ কিছুদিন দক্ষিণ আমেরিকাতেও ছিলো—কি করছিল জানা যায়নি। আফগান সেনাবাহিনীতে ক্যাপ্টেন ছিলো, টাকা পয়সা এদিক সেদিক করায় চাকরি হারায়। পরে, ইংল্যাণ্ডে আসার পর, কয়েকটা ডাকাতি কেসে তাকে সন্দেহ করা হয়, কিন্তু নিরেট অ্যালিবাই থাকায় জিজ্ঞাসাবাদ করেই ছেড়ে দেয় পুলিশ, গ্রেফতার করেনি।'

গভর্ণর গম্ভীর হলেন। 'মুগ্ধ হবার মতো কিছু নয়,' বললেন তিনি। 'তবু, বুদ্ধিমান লোক, পেটে বিদ্যে আছে। ভাবছি ওকে জো সলোমনের সাথে রাখলে কেমন হয়।'

বিস্ময় চেপে রাখতে ব্যর্থ হলো বুকার। 'কেন জিজ্ঞেস করতে পারি, স্যার?'

চেয়ারে হেলান দিলেন গভর্ণর। 'সত্যি কথা বলতে কি, সলোমনের ব্যাপারে আমি খুব উদ্বেগের মধ্যে আছি। সেই যখন থেকে তার স্ট্রোক হলো। আগে বা পরে আবার স্ট্রোক হবে তার—নিয়ম, হতেই হবে—তখন কিন্তু তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি মেডিকেল ট্রিটমেন্ট দরকার হবে। কি ঘটবে কল্পনা করতে পারো, হঠাৎ যদি মাঝরাতে অ্যাটাকটা হয়? যদি মারা যায়?'

'আপনি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছেন, স্যার। সে-ধরনের কিছু ঘটবে না। কেন, প্রতি ঘণ্টায় চেক করা হচ্ছে না ওকে?'

'এক ঘণ্টা অনেক সময়, বুকার। ষাট মিনিটে কতো কিই-না ঘটতে পারে।'

'ওকে দেখে কি স্যার মনে হয় যে হঠাৎ মারা যাবে?'

'স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, এ-সবের খারাপ দিক তো এটাই—

আগে থেকে কিছু টের পাওয়া যায় না।' মাথা নাড়লেন গভর্ণর, 'উঁহুঁ, তুমি যাই বলো, এটা একটা উদ্বেগের বিষয়। আর সমাধান হলো, সলোমনের একজন সেল-মেট। একই প্রকৃতির দু'জন লোককে একই সেলে রাখা ঠিক হবে না, একজন খুন হয়ে যেতে পারে। অথবা দু'জনের গলায় গলায় ভাব হয়ে যেতে পারে, তারপর এক হয়ে যাওয়া দুটো মাথা থেকে কুমতলব গজাবে।' চোখ তুলে প্রিন্সিপাল অফিসারের দিকে তাকালেন তিনি। 'আমার তো মনে হয়, সলোমনের সেল-মেট হবার জন্যে নাহিদ শাহ আদর্শ কয়েদী।' বুকারকে আর কোনো আপত্তি প্রকাশের সুযোগ না দিয়ে তাড়াতাড়ি আবার তিনি বললেন, 'কই, ডাকো, দেখি চেহারাটা কেমন।'

দরজা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়ালো বুকার। 'অ্যাটেনশন, ল্যাড,' হুংকার ছাড়লো সে। 'চেহারায় তাজা একটা ভাব আনো। ভেতরে এসে ম্যাটে দাঁড়াও, তারপর নাম আর নম্বর বলো।'

রাবার ম্যাটটা ডেস্ক থেকে ঠিক তিন ফিট দূরে রাখা হয়েছে। দ্রুত কামরায় ঢুকলো কয়েদী, ম্যাটের ওপর দাঁড়ালো। 'তিরাশি হাজার এক শো উনত্রিশ, নাহিদ শাহ, স্যার,' বললো রানা, টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। ডেস্ক ল্যাম্পের আলো পড়লো ওর মুখে, চেহারাটা খুঁটিয়ে দেখলেন গভর্ণর। ছোটো করে ছাঁটা চুল খুলি কামড়ে বসে আছে, পরনে ডোরাকাটা কয়েদীর পোশাক, ব্যায়ামপুষ্ট মেদহীন শরীর—সব মিলিয়ে চেহারায় মধ্যযুগীয় যোদ্ধার একটা ভাব এনে দিয়েছে। রীতিমতো বিস্মিত

হলেন গভর্নর। কয়েদীকে মোটেও শিক্ষিত বা ভদ্র মনে হলো না তাঁর। বরং মনে হলো, অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা চরিত্র, এর দ্বারা যে-কোনো নিষ্ঠুর কাজ সম্ভব। ভুরু কুঁচকে ডকুমেন্ট-গুলোর ওপর চোখ রাখলেন তিনি।

তিন মাস হলো জেল খাটছে রানা—কাগজে কলমে। আসলে সব মিলিয়ে দিন পনেরো বন্দী-জীবন কাটাতে হয়েছে ওকে, বিভিন্ন জেলখানায়। যেখানেই গেছে ও, একটা করে গোলমাল পাকিয়েছে, ফলে আরেক জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ওকে। হোম অফিসের নির্দেশ ছিলো, কোথাও গোলমাল করলে সেখানে ওকে রাখা চলবে না। বাকি আড়াই মাস স্বাধীন জীবন কাটিয়েছে ও, অত্যন্ত গোপনে।

সময়টা হেলায় নষ্ট করেনি রানা। লণ্ডন অফিসে বসে পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে থাকা রানা এজেন্সির উনসত্তরটা শাখার সাথে যোগাযোগ করেছে। সব শাখাতেই কিছু কেস অমীমাংসিত অবস্থায় পড়ে থাকে, সেগুলো নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। চাকরির আবেদনগুলো বিবেচনা করেছে। কয়েক শো স্টাফের সুবিধে-অসুবিধে আর সুখ-দুঃখ সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছে। বদলির দরখাস্তগুলো পড়ে সিদ্ধান্ত দিয়েছে। এরকম আরো কতো কাজ। আড়াইটা মাস হঠাৎ যেন ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল, টেরও পায়নি। টের পেলো যেদিন গোপন খবর এলো, ফ্রাইডেথর্প জেলখানায় যেতে বলা হয়েছে ওকে। জো সলোমন নাকি কেমন যেন একটু অস্থির।

'ছ' বছর,' রেকর্ড কার্ড থেকে চোখ তুললেন গভর্নর। 'তার-

মানে চার বছর, যদি কোনো গোলমালে না জড়িয়ে পুরো রেমিশন পাও।'

'ইয়েস, স্যার।'

চেয়ারে হেলান দিলেন গভর্ণর। আয়েশ করে একটা সিগারেট ধরালেন। 'তা, এই প্রথম জেল খাটছো, লাগছে কেমন?'

'ভালো, স্যার।'

'ভালো?' বিস্মিত হলেন গভর্ণর।

'জী, স্যার,' বললো রানা। 'যেখানেই গেছি, সবাই আমার সাথে ভালো ব্যবহার করেছে।'

'তাহলে সবখানে গোলমাল পাকিয়েছো কেন? কেন তোমাকে পাঁচবার বদলি করা হয়?'

হেসে উঠলো রানা। সাথে সাথে প্রিন্সিপাল অফিসার কড়া ধমক লাগালো। 'গভর্ণরের সামনে দাঁত বের করছো?' তার চোখ কপালে উঠে গেছে।

'শুনতে দাও কি বলে ও,' গভর্ণর বললেন, তারপর রানার দিকে তাকালেন। 'বলো।'

'বাইরে থাকতে শুনেছিলাম জেলখানা আর নরকের মধ্যে নাকি কোনো পার্থক্য নেই,' বললো রানা। 'কিন্তু ভেতরে ঢুকে উল্টোটাই দেখলাম। সবাই আমাকে খাতির করে। হিসাব মেলাতে পারলাম না। ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখার ইচ্ছে হলো। ভাবলাম, যদি পায়ে পা দিই তাহলেও কি ওরা আমার সাথে ভালো ব্যবহার করবে? যেই ভাবা সেই কাজ…'

দাঁতে দাঁত চেপে প্রিন্সিপাল অফিসার বিড়বিড় করে বললো,

'আরে, এ যে দেখছি আজব এক চিড়িয়া!'

গভর্ণর একটা হাত তুললেন। 'থাক, আর শুনতে চাই না,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন তিনি। 'সত্যি কথা বলতে কি,' তোমার মতো শিক্ষিত, গুণী একজন মানুষের এই পরিণতি অত্যন্ত দুঃখ-জনক। তবে আমার ধারণা, তোমাকে আমরা সাহায্য করতে পারবো। কিন্তু একই সাথে নিজেকে তোমার সাহায্য করতে হবে। চেষ্টা করতে চাও?'

তিক্ত কণ্ঠে রানা বললো, 'নিজেকে সাহায্য করতে গিয়েই তো আজ আমার এই অবস্থা, স্যার!'

মুখে হাতচাপা দিলো প্রিন্সিপাল অফিসার বুকার। কয়েদী ঠাট্টা করলেও, কথাটা অতি কঠিন সত্য বটে।

'কিন্তু এখানে নিজেকে সাহায্য করার একমাত্র উপায় হলো আমাকে সাহায্য করা,' গভর্ণর বললেন। 'তোমাকে আমি জো সলোমন নামে এক লোকের সাথে রাখছি।'

'ইয়েস, স্যার।'

'জো সলোমন দীর্ঘ মেয়াদে জেল খাটছে, কিছুদিন আগে তার একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে,' গভর্ণর বললেন। 'সবাই জানি, আবার তার স্ট্রোক হতে পারে। কখন হবে কেউ বলতে পারে না, কিন্তু রাতে হলেই বিপদ। বিশেষ করে এই রাতের জন্যেই ওর সেলে রাখা হচ্ছে তোমাকে। তেমন কোনো লক্ষণ দেখলেই সাথে সাথে ডিউটি অফিসারকে রিং করবে তুমি। যতোটুকু জানি, এ-ধরনের রোগীদের জীবন-মরণ নির্ভর করে তাড়াতাড়ি চিকিৎসা পাবার ওপর। কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছো তো?'

'ইয়েস, স্যার। পারফেক্টলি, স্যার।' রানার ইচ্ছে হলো ডেস্কের ওপর ঝুঁকে গভর্ণরের কানে কানে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি সব জানেন, জেনেশুনে ভান করছেন?'

'সলোমন মেশিনশপে কাজ করে, তাই না, মিঃ বুকার?' জিজ্ঞেস করলেন গভর্ণর।

'ঝী, স্যার। গাড়ির নাম্বার প্লেট বানায়।'

'তোমাকেও মেশিনশপে পাঠাচ্ছি আমরা,' রানাকে বললেন গভর্ণর। 'ট্রেনিঙে থাকো, দেখা যাক কাজটা তোমার ভালো লাগে কিনা। কি রকম করো সেদিকে আমার একটা চোখ থাকবে।'

রানা কিছু বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন গভর্ণর—ইন্টারভিউ শেষ। রানাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। কর্কশ কণ্ঠে হুংকার ছাড়লো প্রিন্সিপাল অফিসার, 'আউট, বয়!'

করিডরে বেরিয়ে এলো ওরা।

এখানে আসার আগে পাঁচটা জেলখানায় দু'তিন দিন করে ছিলো রানা। সব ক'টা ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তৈরি করা, পুতিগন্ধময় পরিবেশ, আলো-বাতাসহীন অন্ধকার সেলে গরু-ছাগলের মতো গাদাগাদি করে থাকতে হয়েছে নোংরা কয়েদীদের সাথে। আধুনিক জেলখানার কোনো রকম সুবিধে চোখে পড়েনি।

ফাইভেথর্প তৈরি হয়েছে মাত্র দু'বছর হলো। এক বিন্দু মাটি নেই কোথাও, সবটুকু কংক্রিট। ঝকঝক তকতক করছে। এয়ার-

কণ্ডিশন তো আছেই, সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেমের সাহায্যে গোটা জেলখানা গরম রাখা হয়। জানালা নেই, অথচ বাতাসের অভাবে ছটফট করতে হয় না।

প্রিন্সিপাল অফিসারের পিছু পিছু সেন্ট্রাল হলে ঢুকলো রানা। সারি সারি কাঠের বেঞ্চ ফেলা রয়েছে, বেঞ্চের সামনে লম্বা টেবিল, টেবিলে পত্র-পত্রিকা। একটা দরজা দিয়ে লিফটে চড়লো ওরা। কোথাও না থেমে দশ তালায় উঠলো লিফট। ছোটো একটা কংক্রিট ল্যাণ্ডিঙে বেরিয়ে এলো ওরা। সাদা, লম্বা একটা করিডর দেখতে পেলো রানা, একটা স্টীল গেট ছাড়িয়ে আরো অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

গেটের সামনে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। তারপর অদৃশ্য কোনো ইঙ্গিতে আপনা থেকেই খুলে গেল গেট, কোনো শব্দ হলো না। ভেতরে ঢুকলো ওরা। আবার আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল গেট।

ঘাড় ফিরিয়ে গেটের দিকে তাকালো রানা, পাশ থেকে প্রিন্সিপাল অফিসার জিজ্ঞেস করলো, 'অবাক লাগছে?'

মুগ্ধ হবার ভান করলো রানা, কিছু বললো না।

'ইলেকট্রনিক সিস্টেম, রিমোট কণ্ট্রোল,' বললো বুকার। 'জেলখানার শেষ মাথায়, একতালায়, কণ্ট্রোল সেণ্টারে বসে আছে এক লোক, বোতামে সে-ই চাপ দিয়েছে। চুয়াল্লটা টিভি স্ক্রীনে চোখ রেখে পাঁচজন বসে আছে ওরা, পালা করে ডিউটি করছে। গভর্ণরের কামরা থেকে বেরুবার পর থেকে সারাক্ষণ স্ক্রীনে আছি আমরা।'

কিছু একটা বলা দরকার। 'বিজ্ঞানের তেলেসমাতি!'

'ফ্রাইডেথর্প থেকে কেউ পালাবে সেটি হবার নয়—কথাটা মনে রেখো,' করিডর ধরে এগোতে শুরু করে বললো বুকার। 'ভদ্রলোক, ভদ্রলোকের মতো থাকো, দেখবে সবাই তোমার সাথে ভদ্র ব্যবহার করছে। দাপট দেখাবার চেষ্টা করেছো কি মরেছো, ঠাস করে আছাড় খাবে।'

ঠাস? শুনে হাসি পেলো রানার।

করিডরের শেষ মাথায় একটা দরজার সামনে থামলো ওরা। পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুললো বুকার।

বড়সড় সেল, আরো ছোটো আশা করেছিল রানা। জানালা নেই, তবে ইঞ্চি কয়েক চওড়া আর ফুট দুয়েক লম্বা ফাটল দেখা গেল তিনটে, চকচকে আর্মার গ্লাস দিয়ে মোড়া—মানুষ গলার প্রশ্নই ওঠে না। এক কোণে একটা ওয়াশ বেসিন আর টয়লেট।

দু'দিকের দেয়াল ঘেঁষে দুটো বিছানা। একটায় শুয়ে পত্রিকা পড়ছে জো সলোমন। নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে ওদেরকে দেখলো সে, বসলো না।

'তোমার একজন সেল-মেট পাওয়া গেছে,' সলোমনকে বললো প্রিন্সিপাল অফিসার। 'গভর্ণর ভয় করছেন, কোনো নোটিশ না দিয়ে আচমকা তুমি পটল তুলতে পারো। সাবধানের মার নেই, তাই তোমার সাথে একজনের থাকার ব্যবস্থা করা হলো।'

'বুড়ো ভামটার দেখছি আমার ওপর দরদ আছে!' রানার দিকে ভুলেও তাকালো না সলোমন। 'জানা ছিলো না।'

'মুখ সামলে কথা বলো, সলোমন।'

'আর আপনি সামলান ঠোঁট, মিঃ বুকার,' বাঁকা হেসে বললো সলোমন। 'আপনার ঠোঁটের কোণ থেকে সরু একটা লালার সুতো নামছে, সত্যি বলছি। আরেক কোণে ফেনা, ফর গডস সেক!'

সলোমনের দিকে ঝট্ করে এক পা এগোলো প্রিন্সিপাল অফিসার। তাড়াতাড়ি উঠে বসলো সলোমন, আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে একটা হাত তুললো। 'ভুলে যাবেন না আমি অসুস্থ।'

'সত্যিই তাই, তুমি অসুস্থ—মনে ছিলো না,' সহজভাবে হাসলো বুকার। 'লোকে তোমাকে খাতির করতে পারে, সলোমন, তাদের কাছে তুমি বিরাট একটা কিছু হতে পারো, কিন্তু আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে তোমাকে নেহাতই ক্ষুদে দেখায়। যতোবার তোমার দরজায় তালা মারি হাসির ঠেলায় পেটে আমার খিল ধরে যায়।'

অকস্মাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠলো সলোমনের চোখ জোড়া। বাঁকা হাসি অদৃশ্য হলো। আশ্চর্য স্থির হয়ে থাকলো সমস্ত শরীর। তার মুখের হিংস্র ভাব লক্ষ্য করে গা শির শির করে উঠলো রানার। এই মুহূর্তে লোকটা মানুষ খুন করতে পারে।

'চমৎকার,' বললো বুকার। 'ভারি চমৎকার।' ঘুরে দাঁড়িয়ে সেল থেকে বেরিয়ে গেল সে, দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

'বাস্টার্ড!' বন্ধ দরজার দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলো সলোমন। ধীরে ধীরে তার পেশীতে ঢিল পড়লো। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকালো। 'তুমিই তাহলে নাহিদ শাহ? সাত দিন থেকে শুনছি তুমি আসছো।'

'আসলেও দেখছি বাতাসের আগে খবর রটে যায়।' নিজের বিছানার কিনারায় বসলো রানা।

'রটবে না! সবাই মিলে বিরাট একটা সুখী পরিবার আমরা। এখানে তোমার ভালো লাগবে—কি চাও যা তুমি পাবে না? সেন্ট্রাল হিটিং, এয়ার কণ্ডিশনিং, টেলিভিশন—দরকার ছিলো শুধু খানিকটা আভিজাত্যের, তুমি আসায় সে অভাবও আর থাকলো না।'

'মানে!'

'ভান করো না, ভায়া। সবাই সব কিছু জানে তোমার সম্পর্কে। ক্যাপ্টেন ছিলে, ঠিক! তোমার পেশা ছিলো যুদ্ধ। সেলাম, ভায়া, সেলাম। বলছো, এতো সব জানলাম কিভাবে! তুমি যখন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে, আমরা তখন তোমার ইতিহাস মুখস্থ করছি।'

'তোমার সম্পর্কেও পড়া আছে আমার।'

মেঝেতে পা ঝুলিয়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো সলোমন। 'আমার সম্পর্কে?' ভুরু কুঁচকে অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে তাকালো সে। 'কোথায়?'

'বইটার নাম গ্রেট ক্রাইমস অভ দ্য সেঞ্চুরী। গত বছর বেরিয়েছে। পিটারফিল্ড এয়ারপোর্ট ডাকাতির ওপর পুরো একটা পরিচ্ছেদ লেখা হয়েছে। দাঁড়াও, লেখকের নামটা স্মরণ করি···।'

অবিশ্বাসের জায়গায় সলোমনের চেহারায় কৌতুক ফুটে উঠলো।

'মনে পড়েছে—কারসন, কারসন রস,' বললো রানা।

'ব্যাটা একটা ভাঁড়,' তাচ্ছিল্যের সাথে বললো সলোমন।
'ও কি লিখবে শুনি? সিকি ভাগও তো জানে না।'
'সিকি ভাগই বা জানলো কিভাবে?'
'হোম অফিসের বিশেষ অনুমতি নিয়ে আমার সাথে দেখা করেছিল। প্রায় সবটুকুই বলেছিলাম তাকে আমি, কিন্তু লিখতে জানলে তো! প্ল্যানিঙের সবটুকু কৃতিত্ব দিয়ে বসলো রিড কোয়েনকে, উজবুক আর কাকে বলে! প্ল্যান একটা কোয়েন করেছিল বটে, কিন্তু সেটা আমরা মানিনি—কাজেও লাগাইনি।'
'তাহলে তোমার প্ল্যান মতোই কাজটা হয়?'
'অবশ্যই,' কাঁধ ঝাঁকালো সলোমন। 'কোয়েনকে আমার দরকার ছিলো। এটা আমি স্বীকার করি। ও ডাকোটা চালাতে জানতো, সেজন্যেই ওকে নেয়া।'
'আর জন হেরিক?'
'কি করতে হবে বলে দিলে স্রেফ জাদু দেখিয়ে দেবে, তা না হলে কাঠের পুতুল।'
'রিপ হটন?'
'উপস্থিত বুদ্ধি ভালোই, কিন্তু দূরদৃষ্টির ভয়ানক অভাব।'
'কোনো ধারণা আছে এখন তারা কোথায়?'
'ঘটে যদি কোনো বুদ্ধি থাকে তাহলে নিশ্চয়ই কোনো সী-বীচে সুন্দরীদের নিয়ে রোদ পোহাচ্ছে আর টাকা ওড়াচ্ছে।'
'নিজের ভাগ্যের কথা কেউ বলতে পারে না,' হাসলো রানা। 'ঠিক এই মুহূর্তে ওরা হয়তো তোমাকেও দলে টানার বুদ্ধি করছে।'

ভাষাহীন দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো সলোমন। 'কি বললে? আমাকে বের করে নিয়ে যাবে? ফ্রাইডেথর্প থেকে?' অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো সে। 'আফগান যুবক, শেখার এখনো অনেক কিছু বাকি আছে তোমার। এখান থেকে একটা ইঁদুর বেরুতে পারে না, কেউ তোমাকে বলেনি?'

রানা কিছু বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু ওকে থামিয়ে দিলো সলোমন।

'টেলিভিশন ক্যামেরা আর ইলেকট্রনিক গিয়ার আছে এখানে। রিইনফোর্সড কংক্রিট দিয়ে বিশেষ দেয়াল আর পাঁচিল তৈরি করা হয়েছে, ভিতগুলো বিশ ফিট গভীর। কেউ যাতে টানেল বানাতে না পারে,' আক্ষেপের সাথে মাথা নাড়লো সলোমন। 'শুধু শুধু ফ্রাইডেথর্পকে নিশ্ছিদ্র খাঁচা বলা হয়? কেউ আজ পর্যন্ত পালাতে পারেনি এখান থেকে।'

'তা না পারুক,' বললো রানা। 'কিন্তু পালাবার রাস্তা আসলে ঠিকই একটা না একটা থাকে।'

'আমাদের ভাগ্যে তাহলে কি জুটলো আজ? দুর্লভ একটা প্রতিভা?'

'যথেষ্ট দুর্লভ।'

'কিন্তু সে প্রতিভা রুথম্যান মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিতে কোনো কাজে আসেনি। তা না হলে তুমি এখানে কেন?'

'কাজে আসেনি মানে?' কঠিন চোখে তাকালো রানা, যেন ওর কৃতিত্বটাকে ছোটো করে দেখায় রাগ হয়েছে। 'কেন, টাকা নিয়ে বেরিয়ে আসিনি আমি? ধরিয়ে দিলো তো হারামজাদী

মেয়েটা···।'

'আর বলো না, ভাই!' উরুতে চটাস করে চাপড় মারলো সলোমন। 'এই মেয়ে জাতটা সর্বনাশ করে ছাড়লে! যেখানে যতো ব্যর্থতা দেখবে, খোঁজ নাও, ঠিক একটা মেয়ে রয়েছে তার পেছনে। পুরুষরা অবশ্য কম নয়, লাই দিয়ে একেবারে মাথায় চড়িয়ে রাখে। এই একটা দুর্বলতা থেকে আমি ভাই একেবারে মুক্ত।' হঠাৎ গলা খাদে নামালো সে, যেন গোপন কোনো তথ্য ফাঁস করছে। 'তারমানে আবার ধরে নিয়ো না আমার ওসব কিছু নেই! হাঃ হাঃ হাঃ! স্রেফ লোহা, ডিয়ার ফ্রেণ্ড, স্রেফ লোহা। কিন্তু ওর সাথে মন বা হৃদয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। আমার নীতি হলো—ধরি মাছ, না ছুঁই পানি। গোপন কথা বন্ধুকে বলতে পারি, একটা মেয়েকে কেন বলতে যাবো?'

'তোমাদের ধরা পড়ার কারণও তো আসলে একটা মেয়ে, তাই না?'

'শুনলে বিশ্বাস করবে, মেয়েটাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করেছিল কোয়েন? বারো বছর পর মেয়েটা ধিঙ্গি হলো। কোয়েন ভাবলো, এবার শালীকে নিয়ে মৌজ করবো। কিন্তু তা কি হয়! মেয়েটা যে কোয়েনকে বাপ বলে ভাবতো। ডাকাতি করার পর কোয়েনের ফুর্তি ধরে না, একরাতে পালিত কন্যার গায়ে হাত দিয়ে বসলো। সকালে বাজারে যাবার নাম করে বেরিয়ে গিয়ে পুলিশকে খবর দিলো মেয়েটা।'

'কিন্তু টাকাগুলো পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি।'

'সেই আনন্দেই তো এখনো হাসতে পারি, দোস্ত।' নিঃশব্দে

হাসলো সলোমন। 'ভোগ করতে পারি বা না পারি, আমার টাকা আমারই আছে।'

হঠাৎ মন খারাপ করে মেঝের দিকে তাকালো রানা। দীর্ঘশ্বাস ফেললো একটা। 'আমার কপাল পুরোটাই ফাটা। টাকাটাও হারালাম, ধরাও খেলাম।'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সলোমনের নিষ্ঠুর চেহারায় একটু যেন কোমল ভাব ফুটলো। বিশটা সিগারেটের একটা প্যাকেট বের করে রানার দিকে ছুঁড়লো সে। 'মন খারাপ করো না তো,' বললো সে। 'আর কেউ না জানুক, আমি জানি রুথম্যান থেকে পৌনে দু'লাখ পাউণ্ড নিয়ে বেরিয়ে আসা স্রেফ অসাধ্য সাধন। ধরা পড়ে গেছো তার কারণ তোমার অ্যামেচার স্ট্যাটাস। আরেকটু যদি কৌশলী হতে পারতে, বাজি মেরে দিয়েছিলে।'

কোল থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিয়ে রানা বললো, 'তুমি বোধহয় এখানে খুব আরামেই আছো।'

আহ্লাদের হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সলোমনের চেহারা। 'আমার কোনো অভিযোগ নেই। সিগারেট? যতো খুশি পেতে পারি। কিভাবে, জিজ্ঞেস করো না। কেউ ধোঁয়া গিলতে চাইলে তাকে আমার কাছে আসতে হবে। বুড়ো নরটন আমার কাছে পাঠিয়েছে তোমাকে, ওর প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।'

'উনি বললেন তুমি নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে। সিরিয়াস?'

'বেশ কিছু দিন হলো একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। সিরিয়াস কেন হতে যাবে।' কাঁধ ঝাঁকালো সলোমন। 'এমন তো অনেক

মানুষেরই হয়।'

'তোমার শরীর নিয়ে তাঁকে খুব উদ্বিগ্ন মনে হলো। হঠাৎ রাতের বেলা যদি অসুস্থ হয়ে পড়ো। এতোই যখন ভয় পাচ্ছেন তোমাকে হাসপাতালে পাঠালেই তো পারেন।'

কর্কশ একটা শব্দ করলো সলোমন। 'হোম অফিস অনুমতি দিলে তো! ওদের ভয়, আমার টাকার ওপর হাত দেয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে ভেবে লণ্ডন গ্যাংগুলো হাসপাতাল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে আমাকে।' এদিক ওদিক মাথা নাড়লো সে। 'না হে, কোথাও যাওয়া-যাওয়ি আমার কপালে নেই। ক্রাইডেথর্পই আমার ঠিকানা।'

'আরো পনেরো বছরের জন্যে?'

সিলিং থেকে চোখ নামিয়ে মৃদু শব্দে হাসলো সলোমন। 'সেটা ভবিষ্যৎই বলতে পারে। ধরাও, তারপর আমাকে একটা দাও।'

নিজেরটা ধরিয়ে সিগারেটের প্যাকেট ছুঁড়ে ফেরত দিলো রানা। বোঝাই যাচ্ছে, কথা বলে মজা পাচ্ছে সলোমন, রানা তাকে বাধা না দিয়ে শুনে গেল।

দুটো বিছানায় পরস্পরের দিকে মুখ করে আধশোয়া অবস্থায় রয়েছে ওরা, পিঠে বালিশ। জীবনে যা যা ঘটেছে তার প্রায় সবই উথলে বেরিয়ে এলো সলোমনের পেট থেকে। ক্যামবারওয়েল এতিমখানায় শৈশব আর কৈশোর কেটেছে, মা-বাবার পরিচয় জানা নেই। কেয়ারটেকার থেকে শুরু করে দারোয়ান পর্যন্ত সবার যৌন-বিকৃতির শিকার হয়েছিল। এতিমখানা থেকে

মাঝে মধ্যে বেরুবার ব্যবস্থা করে দিয়ে দারোয়ানরাই তাকে বিপথে যাবার সুযোগ করে দেয়। চুরি বিদ্যায় হাত পাকানোর সাথে সাথে লেখাপড়াটাও বাধ্য হয়ে শিখতে হয়। স্কুল ফাইনাল শেষ করে নেভীতে যোগ দেয়। বিয়ে করেনি, কোথাও কোনো আপনজন নেই।'

'নিজের স্বার্থ নিজেকেই দেখতে হয়, বুঝলে,' রানাকে বললো সে। 'এই শিক্ষাটা আমি অবশ্য ঠকে শিখেছি। তোমার পাওনা জিনিস ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে আশপাশে কেউ না কেউ আছেই! এম. টি. বি.-তে আমি যখন পি. ও., কোয়ারলে নামে আমাদের এক ক্যাপটেন ছিলো—তরুণ সাব-লেফটেন্যান্ট। গুড ফর নাথিং, স্রেফ কোনো কাজের না। তাকে আমি বয়ে নিয়ে আসি—কাঁধে ফেলে বয়ে নিয়ে আসি! ফকল্যাণ্ড যুদ্ধের কথা বলছি, অ্যাটাক শুরু করার সাথে সাথে গুলি খেলো সে। ব্রিজে, স্কিপারের চেয়ারে বসে মাছের মতো খাবি খেতে লাগলো—সমস্ত রক্ত কুলকুল করে বেরিয়ে আসছে। লোকটা মারা যাচ্ছে জেনেও কিছুই আমাদের করার ছিলো না। নিজের কাঁধে দায়িত্ব তুলে নিলাম, নতুন করে শুরু করলাম অ্যাটাক। দুটো টর্পেডো ছুঁড়ে শত্রুপক্ষের একটা জাহাজ দিলাম ডুবিয়ে। আমরা ফিরে আসার পর কি ঘটলো? ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কোয়ারলেকে দেয়া হলো ভিক্টোরিয়া ক্রস। আর আমার নামটা শুধু উল্লেখ করা হলো ডিসপ্যাচে।'

চেহারায় সহানুভূতি ফুটিয়ে তুললো রানা। মনে মনে হাসছে ও। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকলে একটা গল্প কি রকম বদলে যায়।

সলোমন বক বক করে চলেছে, সিলিঙের দিকে তাকিয়ে ঘটনাটা স্মরণ করলো রানা। জেলখানায় আসার আগে, বি-এস-এস ডি-টু থেকে সলোমনের অফিশিয়াল রেকর্ডের ফাইল যোগাড় করে পড়েছে রানা। নির্জলা সত্যি কথাটা হলো, গুরুতর আহত হয়েও কোয়ারলে ব্রিজ থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে অস্বীকার করে। কোয়ারলে ধরে নিয়েছিল সে মারা যাচ্ছে, কিন্তু তারপরও কাঁধ থেকে দায়িত্ব নামায়নি। ব্রিজে উপস্থিত থেকে আক্রমণে নেতৃত্ব দেয় সে। সলোমন ভালো কাজ দেখায়—তুমুল গোলাবর্ষণের মধ্যেও দিশেহারা হয়নি সে—তার ব্যক্তিগত সাহস প্রশ্নাতীত, কিন্তু পুরোটা সময় কোয়ারলের সরাসরি নির্দেশে কাজ করে সে।

ঘটনাটা বর্ণনার সময় সলোমনের চোখে-মুখে আবেগ ফুটে উঠতে দেখেছে রানা। লোকটা কি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে সমস্ত কৃতিত্ব তার ছিলো? হতে পারে, অসম্ভব নয়—বন্ধু-বান্ধব আর নিজেকে এতোবার মিথ্যে গল্পটা শুনিয়েছে যে এখন হয়তো সেটাই ওর কাছে সত্যি হয়ে গেছে। ওর হয়তো ধারণা, কোয়ারলের বদলে তাকে ভিক্টোরিয়া ক্রস দেয়া উচিত ছিলো।

'তারপর, নেভী থেকে বেরুবার পর?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'কারসন লিখেছে, এরপর তুমি নাকি চোরাচালানে হাত দাও।'

'ব্যাটাচ্ছেলে ঠিকই লিখেছে,' নিঃশব্দে হাসলো সলোমন। 'চ্যানেলে কাজ করতাম আমরা। বাতিল একটা এম. টি. বি.-কে মেরামত করে নিয়েছিলাম। এক বছর চুটিয়ে ব্যবসা করি।'

'কি চালান করছিলে—মদ ?'

'মদ, হ্যাঁ। তার সাথে সিগারেট, নাইলন, ঘড়ি, কখনো-সখনো স্মল আর্মস—যখন যেটা পেতাম।'

'ড্রাগ ? শুনেছি ড্রাগে নাকি ভালো পয়সা।'

'কি মনে করো তুমি আমাকে!' সলোমন ভারি অসন্তুষ্ট হলো। 'ওসব নোংরা জিনিস আমি ছুঁয়েও দেখি না!'

কথাটা সত্যি। সলোমনের ফাইলেও তাই লেখা আছে। টাকা বানাবার সবচেয়ে বড় দুটো কাজে ভুলেও হাত লাগাবে না সলোমন—নারী আর ড্রাগ। সুন্দর নীতিবোধ, ওর চরিত্রের সাথে একেবারেই মেলে না। কোর্টে বিচার চলার সময় এই প্রসঙ্গটা নিয়ে দু'হাতে লিখেছিল সাংবাদিকরা, তারা ওকে আধুনিক রবিন হুড বানিয়ে ছাড়ে। টাকাগুলো কোথায়, এই প্রশ্নের উত্তর সলোমন কোর্টে বলেছিল, যেখানেই থাক, যথা সময়ে ওগুলোর একটা অংশ লণ্ডনের গরীব মানুষের পকেটে ঠিকই পৌঁছে যাবে। এই সব লেখা পড়ে সাধারণ মানুষও সলোমনকে মহৎপ্রাণ বলে ভাবতে শুরু করে। কলাম লিখিয়েরা লেখে, পিতৃপরিচয়হীন জো সলোমনকে এই সমাজই অপরাধী বানিয়েছে, তাই বিচার যদি হতেই হয় তবে সবার আগে এই সমাজের বিচার হোক, ইত্যাদি। অথচ পিটারফিল্ডে যে ডাকোটাটা হাইজ্যাক করা হয়েছিল সেটার পাইলট ডাকাতদের বাধা দেয়ায় প্রচণ্ড মার খায়, একটা পা হারিয়ে বেচারা চাকরি খুইয়েছে, সে-কথা কেউ তোলেনি। পরে খবর নিয়ে আরো জেনেছে রানা, পাইলট তার একটা চোখও হারিয়েছিল।

অপরাধ এই একটাই করেনি সলোমন। সূত্রহীন অপরাধের সাথে জড়িত সন্দেহে সলোমনকে বহুবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। বেশিরভাগই ডাকাতির কেস ছিলো সেগুলো, প্রায় প্রত্যেকটিতে নিরীহ মানুষ আহত হয়, অনেকে পরে মারা যায় হাসপাতালে। এইসব মৃত্যুর জন্যে সলোমনকে দায়ী করা হয়নি।

হঠাৎ বাস্তবে ফিরে এলো রানা, সলোমন তখনো কথা বলে চলেছে।

'সে একটা সময় গেছে বটে! এমনভাবে কাজ সারতাম পুলিশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যেতো। স্মোক এলাকায় আমার টিমটা ছিলো সবচেয়ে দুর্ধর্ষ, দলের নামটাও ছিলো আমার দেয়া—মনস্টারস! একের পর এক কাজ উদ্ধার করেছি, অথচ পুলিশ একটার সাথেও আমাদের জড়াতে পারেনি।'

'বোঝাই যায়, দলে যোগ্য লোক পেয়েছিলে তুমি,' বললো রানা। 'মাসের পর মাস পুলিশকে কাঁচকলা দেখানো সহজ কথা নাকি!'

'ধরে আমাকে প্রত্যেকবারই নিয়ে গেছে,' বললো সলোমন। 'কিন্তু এমন সব অ্যালিবাই তৈরি থাকতো, উকিল থানায় পৌঁছেই বের করে আনতে পারতো আমাকে। থানার সামনে আমার বোধহয় কয়েক হাজার ফটো তোলা হয়েছে। এমন কোনো হপ্তা ছিলো না আমার ছবি না ছাপা হয়েছে কাগজে!'

'এখন অবশ্য সময়টা খারাপ যাচ্ছে!'

দাঁত বের করে হাসলো সলোমন। 'ধৈর্য ধরো, বৎস—স্রেফ

ধৈর্য ধরো। প্রথম পাতায় আবার আমাকে হাসতে দেখবে তোমরা!'

বিছানার ওপর উঠে বসলো রানা। 'কি বললে?'

হাসিটা সলোমনের সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো। 'কিছু বলেছি নাকি? হয়তো বা। ভুলে গেছি।' তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকলো সে, এই মুহূর্তে রানার যেন কোনো অস্তিত্বই নেই।

বিছানায় শুয়ে গোটা ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছে রানা। সলোমন সম্পর্কে বইতে কি যেন লিখেছে কারসন? হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বিপজ্জনক অপরাধের প্রতি এমন অস্বাভাবিক ঝোঁক আছে সলোমনের, ব্যাপারটাকে আত্মহননের আকুতি বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না। উত্তেজনা আর বিপদের ঝুঁকি তার কাছে মদ আর মাংস। ভিলেন হতে ভালোবাসে সে, এটা তার একটা নেশার মতো। রানা ভাবলো, আসলে হিরো হতে পারেনি বলেই ভিলেন হয়েছে লোকটা, কিন্তু হিরো হবার সাধ তাকে ছেড়ে যায়নি পুরোপুরি। গরীব মানুষের মধ্যে টাকা পয়সা যদি সত্যি কখনো সে বিলিয়ে থাকে, সেটা ওই হিরো হবার গোপন ইচ্ছে থেকে বিলিয়েছে। খবরের কাগজে ছবি ছাপা হলে খুশি হওয়ার পিছনেও সেই একই কারণ।

তবে যে যাই বলুক, একটা কথা সত্যি, জো সলোমন রবিন হুড নয়। লোকটা হিংস্র একটা পশু, তার প্রধান অস্ত্র নিষ্ঠুরতা এবং দুঃসাহস। যখন খুশি হাসতে পারে বলে লোকে তাকে সহজে মূর্তিমান শয়তান বলে চিনতে পারে না।

বিছানার কিনারায় বসে জুতোর ফিতে খুলতে শুরু করলো রানা। 'ভাবছি শুয়ে পড়বো। সারাটা দিন গাড়িতে ছিলাম তো!'

সিলিং থেকে চোখ নামিয়ে মুখের সামনে একটা পত্রিকা মেলে ধরলো সলোমন। 'ঠিক আছে, দোস্ত। কিন্তু সাবধান, দুঃস্বপ্নগুলোকে একেবারেই পাত্তা দিয়ো না!'

'গুডনাইট,' বলে শুয়ে পড়লো রানা, চাদরটা টেনে বুকের কাছে এনে চোখ বুজলো। ভাবছে, মেশিন শপে কি রকম পরিবেশ কে জানে। বুকার বললো, গাড়ির নম্বর প্লেট তৈরি করতে হবে। জীবিকা হিসেবে চটের বস্তা সেলাই করার চেয়ে গাড়ির প্লেট তৈরি করা তবু ভালো। শুধু যদি সেপাইগুলো বিরক্ত না করে, জীবন মোটামুটি ভালোই কাটবে।

হঠাৎ রানার ভুরু কুঁচকে উঠলো। আরে, আরে, নিজেকে দেখছি একজন কয়েদী বলে ভাবতে শুরু করেছি! সোহানা শুনলে খুন হবে হেসে। ফোড়ন কাটতে ছাড়বে না, তোমার মধ্যে একজন অপরাধী বাস করে।

মুচকি একটু হেসে পাশ ফিরে শুলো রানা। তারপর ঘুমিয়ে পড়লো।

আট

'পুনর্বাসন না ঘোড়ার আণ্ডা!' মেশিন শপের ঘটাং ঘটাং আর হিস হিস শব্দকে ছাপিয়ে উঠলো সলোমনের কণ্ঠস্বর। 'রিভলভিং চেয়ারে বসে হোম অফিসের পেটমোটা আমলারা বিপথগামীদের জন্যে এই প্রজেক্ট চালু করেছে। দিনে বারো ঘণ্টা গরমে সেদ্ধ হও, গাড়ির নম্বর প্লেট বানাতে শিখে দক্ষ শ্রমিক হও, ভবিষ্যতে সুস্থ জীবন কাটানো কোনো সমস্যা হবে না। বুড়বাকদের মাথায় ঢোকে না এই কাজের মজুরি হলো হপ্তায় পাঁচ পাউণ্ড অথচ একজন লোকের সৎভাবে বেঁচে থাকতে হলে লাগে বিশ পাউণ্ড!'

হাতের প্লেটটা ডাই স্ট্যাম্পিং মেশিনের নিচে সাবধানে রাখলো রানা, তারপর লিভার টানলো। মৃদু হিস হিস শব্দ বেরিয়ে এলো হাইড্রলিক প্রেস থেকে। সমতল স্টীল প্লেটের গায়ে নম্বরগুলো শক্তভাবে এঁটে বসলো। প্লেটটা তুলে দেখলো রানা, তারপর একটা ফাইল দিয়ে ঘষে ঘষে কর্কশ কিনারাগুলো

পরিষ্কার করলো। সলোমনের কথাগুলো কানে বাজছে এখনো।

একটুও বাড়িয়ে বলেনি সলোমন। তিন হপ্তা মেশিন শপে কাটিয়ে এই সত্যটুকু হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছে রানা। একটু দূরে বসা প্যাট্রিক ফিলিপস-এর দিকে তাকালো ও। তহবিল তছরুপের দায়ে সাত বছর জেল খাটছে লোকটা, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ছিলো। মেশিন শপে তার সহকারী, চার্লস ওয়ার্ণার ছিলো স্কুল-মাস্টার। ছোটোখাটো, নিরীহদর্শন, হাসিখুশি লোক ওয়ার্ণার, স্ত্রীকে পরপুরুষের সাথে বিছানায় দেখে খুন করার পর যাবজ্জীবন খাটছে। অল্প-মজুরির কাজ শিখিয়ে এ-সব লোককে কিভাবে সমাজে পুনর্বাসন করা সম্ভব? ভাবতে গিয়ে নিজ দেশের দুরবস্থার কথা চলে এলো: তবু তো এরা ভাবে, আর আমরা?

অকস্মাৎ অট্টহাসির শব্দে বাস্তবে ফিরে এলো রানা, সেই সাথে স্বস্তিবোধ করলো। দেশের করুণ অবস্থার কথা চিন্তা করতে গেলে মাথা গরম হয়ে যায় ওর, আজও হতে যাচ্ছিলো। আওয়াজটাই জানিয়ে দিলো, হাসিটা জো সলোমনের। একজন কয়েদীর রসিকতা শুনে হাসছে সে।

একমাত্র সলোমনই এভাবে গলা ছেড়ে হাসতে পারে। সেপাই তাকে কিছু বলবে না।

সাধারণ কয়েদীরাও তাকে বিশেষ সমীহ করে চলে। জেলখানার ভেতর লোকজনের মর্যাদার মাপকাঠি অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে। কে কতো টাকার দাঁও মারতে গিয়ে ধরা পড়েছে, কার কতো বছরের জেল হয়েছে, কে কোন সমাজের লোক

ইত্যাদিও বিবেচনা করা হয়। সমস্ত বিচারেই সলোমন ফ্রাইডে-থর্পের রত্ন, সবচেয়ে সম্মানের আসনটা তার দখলে। ওদের এক-জন হয়ে এখানে আসার পর রানা উপলব্ধি করেছে, কয়েদীরা ওকেও বেশ খানিকটা সমীহ করে। বিদেশী বলে নয়, উচ্চ-শিক্ষিত বলে। ডাকাতি করা টাকার অংকটাও বড় করে দেখছে। সলোমন না থাকলে সম্মানের সেরা আসনটা না চাইতেই পেয়ে যেতো রানা।

আস্তে-ধীরে হেঁটে এলো ওয়ার্ণার, রানার পাশে বেঞ্চের ওপর এক গাদা খালি প্লেট রাখলো। 'সবগুলো তোমার, নাহিদ,' বলে আরেক দিকে হেঁটে গেল সে।

লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা। ক্লান্ত, দুর্বল, ভার-বাহী পশুর মতো লাগলো তাকে। মুখটা ঘেমে আছে, ফলে পিছলে নাকের ডগায় নেমে এসেছে চশমাটা। লোকটার প্রতি সহানুভূতিতে ছেয়ে গেল রানার মন। ভদ্র একজন স্কুল-মাস্টারের কপালে কি দুঃসহ দুর্ভোগ। হঠাৎ রাগ হয়ে গেল রানার। এ-ধর-নের ভারি কাজের উপযুক্ত নয় লোকটা—জেল কর্তৃপক্ষ দেখতে পায় না নাকি?

নিজেকে শান্ত করলো রানা। কোথায় কি অন্যায় হচ্ছে দেখার জন্যে এখানে আসেনি সে। সলোমনের ওপর নজর রাখতে হবে তার। লোকটার সহানুভূতি আর বন্ধুত্ব অর্জন করতে হবে। জানার চেষ্টা করতে হবে তার ভবিষ্যৎ প্ল্যান। দেড় মাসের বেশি হতে চললো বদরুল হাসানের কোনো খবর নেই। ওর কপালে কি ঘটেছে জানতে হবে তাকে।

জানতে হবে কাউন্টের পরিচয়। শয়তানটাকে থামাতে হবে।

ছোটোখাটো কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা ব্যাপারে এরই-মধ্যে সাফল্য অর্জন করেছে রানা। ওর অভিনয়ে কোনো খুঁত ধরা পড়েনি, কয়েদী এবং পুলিশরা ওর নাহিদ শাহ পরিচয় নিঃ-সন্দেহে বিশ্বাস করেছে। ভয় ছিলো, সলোমন ওকে ভালোভাবে না-ও গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু ঘটেছে উল্টোটা—দু'জন এখন ওরা পরস্পরের বন্ধু।

জো সলোমন আর সব বড় মাপের অপরাধীর মতোই অত্যন্ত জটিল চরিত্রের লোক। বাইরে থেকে দেখে তার সম্পর্কে কিছুই বোঝার উপায় নেই। কখনো সে শান্ত, নিরীহদর্শন স্কুল-মাস্টারের চেয়েও বিনয়ী আর ভদ্র। আবার কখনো সে বিস্ফোরণোন্মুখ আগ্নেয়গিরির মতো থমথমে একটা হুমকি।

ফাইলে, বা ওর সম্পর্কে লেখা বইতে যাই থাক, ফ্রাইডেথর্পে আসার পর লোকটা সম্পর্কে আশ্চর্য সব গল্প শুনেছে রানা। একবার মেফেয়ার ম্যানসনে ডাকাতি করে সে। ডাকাতি করার আগে জায়গাটা ভালো করে দেখার জন্যে একদিন, দিনের বেলা, সেখানে হাজির হলো সলোমন। ম্যানসনে তখন বিবাহোত্তর উৎসব পার্টি চলছিল। দারোয়ানদের সসম্ভ্রম স্যালুট নিয়ে সহাস্যে ভেতরে ঢোকে সে, নিমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে মিশে যায়, ভরপেট খাওয়াদাওয়া সারে, মজার মজার কৌতুক শুনিয়ে উপস্থিত মেহমানদের পেটে খিল ধরিয়ে দেয়, তারপর সদ্য বিবাহিত ভদ্রলোকটির পকেট মেরে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে। বাইরে, ফুটপাতে, দেউলিয়া এক লোক তার পথরোধ করে দাঁড়ায়,

সাহায্যের আবেদন নিয়ে। সদ্য চুরি করা মানিব্যাগ খুলে সলোমন দেখে তাতে অল্প কিছু টাকা রয়েছে—সব টাকাই লোকটাকে দিয়ে সেখান থেকে দ্রুত কেটে পড়ে সে।

এ-ধরনের ঘটনা তার সম্পর্কে আরো অনেক শোনা যায়। অবশ্য সত্য-মিথ্যে যাচাই করার কোনো উপায় নেই। সব ক'টা গল্পেরই উৎস সলোমনের নিজের মুখ। তবে তার সাথে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়ে রানা জেনেছে, যেখানে স্বার্থের প্রশ্ন সেখানে নির্মম হতে দ্বিধা করে না লোকটা, অকস্মাৎ চোখ উল্টে নিতে তার জুড়ি নেই। অথচ এমনিতে লোকটা হাসিখুশি, এমন কি কখনো কখনো তাকে সরল বলেও মনে হয়। আসলে তা সে নয়।

হঠাৎ রানা লক্ষ্য করলো, ওর দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছে সলোমন। 'কি এতো ভাবছো, শুনি?' সহাস্যে জিজ্ঞেস করলো সে। 'যা ভাবছো তা না-ও ঘটতে পারে।'

ভাবার কথা যদি ওঠে, কথাটা সলোমনের জন্যেই খাটে। গত দু'দিন থেকে কি যেন চিন্তা করছে সে। প্রায় তাকে অন্যমনস্ক দেখায়।

একজন কয়েদী এগিয়ে আসায় রানার চিন্তায় আবার বাধা পড়লো। লোকটার নাম লিফার, গায়ে সাংঘাতিক শক্তি রাখে। একটা ট্রে ঠেলে নিয়ে এলো সে, তৈরি করা প্লেটগুলো নিয়ে যাবে। রানাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আমার জন্যে কিছু আছে নাকি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিতে বেঞ্চের ওপর স্তূপ করা প্লেটগুলো দেখালো রানা। লোকটাকে বিশেষ পছন্দ করে না ও। সে-জন্যে

সম্ভবত তার অপরাধের ধরনটাই দায়ী। দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে আহত করে সে, বাচ্চার মাকে ধর্ষণ করে। দশ বছরের সাজা খাটছে। পেশায় চোর, এটাই তার প্রথম ধর্ষণ। চেহারাই বলে দেয় অসৎ লোক। গলায় কি একটা অসুখ আছে, তার ওপর চব্বিশ ঘণ্টা মদ খেতো, গলার আওয়াজ বেসুরো আর ভাঙা ভাঙা। ট্রলিতে প্লেট তুলতে তুলতে সলোমনের দিকে তাকালো সে। বললো, 'আমাকে দুটো সিগারেট দাও না, সলোমন।'

'তিন হপ্তা হলো চালাচ্ছি তোমাকে,' বললো সলোমন। 'আর পাবে না। বিনিময়ে কিছু ফেলো, তারপর দেখা যাবে।'

দশাসই লিফার বেসুরো গলায় কাকুতিমিনতি শুরু করলো, 'একটু দয়া করো, সলোমন। দু'দিন একটা টান পর্যন্ত দিইনি। আমি পাগল হয়ে যাবো।'

সলোমন নিরুত্তর।

এগিয়ে গিয়ে তার একটা হাত ধরলো লিফার। 'দাও না ভাই···!' মনে হলো প্রয়োজন হলে সলোমনের পায়ে পড়বে সে। 'সত্যি বলছি, সিগারেট না পেলে পাগল হয়ে যাবো···।'

হাতটা ঝাপটা দিয়ে ছাড়িয়ে নিলো সলোমন। 'কি আজে-বাজে বকছো! সে তো আগেই হয়েছো তুমি। ওদের উচিত ছিলো বছর কয়েক আগেই তোমার চিকিৎসা করানো। ভাগো এখান থেকে। তোমাকে আমি সহ্য করতে পারছি না।'

লিফারের মতো লোকদের সাথে এ-ধরনের কর্কশ ব্যবহার করেই অভ্যস্ত সলোমন। বেঞ্চের শেষ মাথায় চলে এসেছিল

রানা কিছু পেরেক নেয়ার জন্যে, ফেরার জন্যে ঘুরতেই দেখলো অদম্য আক্রোশে বিকৃত হয়ে গেছে লিফারের চেহারা। অকস্মাৎ অসুরটার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল, একটা র‍্যাট'স টেইল ফাইল তুলে নিলো সে। ফাইলের শেষ মাথাটা ছুঁচালো, অস্ত্র হিসেবে ভয়ঙ্কর —সেটা মাথার ওপর তুললো সে, সলোমনের বিশাল নগ্ন পিঠে গাঁথবে।

সাবধান করে দেয়ার সময় নেই, ঝট্ করে হাতুড়িটা তুলে নিয়ে সবটুকু শক্তি দিয়ে ছুঁড়ে মারলো রানা। সরাসরি লিফারের বুকে গিয়ে আঘাত করলো হাতুড়ি, আহত পশুর কাতর ধ্বনি বেরিয়ে এলো তার মুখ থেকে। টলে উঠলো সে, হাত থেকে পড়ে গেল ফাইলটা।

চমকে ঘুরলো সলোমন। হাতুড়ি, ফাইল, আর লিফারের যন্ত্রণাকাতর চেহারা দেখে যা বোঝার বুঝে নিলো সে। সবশেষে রানার দিকে তাকালো সে। চোখ নয়, যেন কালো স্লেট পাথর। শান্ত ভঙ্গিতে এক পা এগিয়ে এসে ফাইলটা তুলে নিলো সে। 'এটা তোমার, লিফার?'

হতভম্ব লিফার সলোমনের দিকে তাকিয়ে থাকলো। তারপর হঠাৎ ট্রলিটা আঁকড়ে ধরে ঠেলে নিয়ে চললো দ্রুত।

কাজ যেমন চলছিল তেমনি চলছে, যান্ত্রিক শব্দগুলোর কোনো উত্থান বা পতন ঘটেনি, অথচ কামরার এদিকে যারা রয়েছে তারা প্রত্যেকে লক্ষ্য করেছে ব্যাপারটা।

লিফার বেশি দূর যায়নি, দুটো ব্যাপারে সচেতন হলো রানা। সলোমন ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো আরউইন হানিকাট-

এর উদ্দেশে—লম্বা, শক্ত-সমর্থ একজন স্কট হানিকাট, কামরার আরেক প্রান্তে কাজ করছে। এবং চ্যাপল, একজন সেপাই, এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

'কি হচ্ছে এখানে?' চ্যাপল জানতে চাইলো।

'কিছুই না, মিঃ চ্যাপল, স্যার,' বললো সলোমন। 'দম দেয়া পুতুলের মতো কাজ করে যাচ্ছি আমরা।'

চ্যাপল বয়সে তরুণ, বেশি দিন হয়নি আর্মি থেকে বেরিয়ে এসেছে। গোঁফ না ছেঁটে বয়স বাড়াবার মরিয়া একটা চেষ্টা আছে তার মধ্যে। বেঞ্চের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, হাত দুটো শরীরের দু'পাশে। এবার ওর দিকে তাকালো চ্যাপল। আর্মিতে লোকটা ল্যান্স কর্পোরালের বেশি উঠতে পারেনি, দুঃসময়ের শিকার ভাড়াটে মেজরকে দু'পয়সা দাম দেয় না সে। ঝাঁঝের সাথে রানাকে বললো সে, 'নতুন এসে তুমিও দেখছি খুব বাড় বেড়েছো, শাহ! হাত গুটিয়ে বসে আছো কি মনে করে? সরকার খাওয়া দেয় না? নাকি প্লেট তৈরি করাটাকে ছোটো কাজ মনে করছো?'

চ্যাপলের খুব কাছে সরে এলো সলোমন। নরম, ফিসফিসে গলায় কথা বললো সে। পরিষ্কার উচ্চারণ, সবাই শুনতে পেলো, 'নাহিদ কাজ করছে, মিঃ চ্যাপল, স্যার। প্রাণপণ খাটছে ও। আমি বলি কি, এখানে চেষ্টা বাদ দিয়ে, আপনি বরং লক্ষ্মী ছেলের মতো কামরার ওদিকে কোথাও...অ্যা, কি বলেন? পরামর্শটা পছন্দ হয়, মিঃ চ্যাপল, স্যার?'

টুঁ-শব্দটিও করলো না চ্যাপল, কড়া চোখে সলোমনের

দিকে তাকাবার পর্যন্ত সাহস হলো না তার। সাদা মুখে পরিষ্কার ভীতি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো সে। কামরার আরেক প্রান্ত থেকে আচমকা আর্তনাদ ভেসে এলো। কেটে পড়ার অজুহাত তৈরি হওয়ায় পরম স্বস্তি বোধ করলো সে, ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে দ্রুত সরে গেল।

কাজ থামিয়ে দিয়েছে সবাই, এক এক করে মেশিন বন্ধ করে দেয়ায় ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে এলো যান্ত্রিক কোলাহল। এই সময় আরউইন হানিকাটকে উদয় হতে দেখলো রানা, দেয়াল ঘেঁষে হেঁটে আসছে সে, তেল চিটচিটে নোংরা একটা তোয়ালে দিয়ে ঘষে ঘষে হাত মুছলো। শান্ত, নির্বিকার চেহারা।

'ওদিকে আবার কি হলো, আরউইন?' জিজ্ঞেস করলো সলোমন।

'মাইক লিফার জঘন্য একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে বসেছে,' শান্ত গলায় বললো হানিকাট। 'কামারের ঘরে এক বালতি ফুটন্ত পানি ছিলো, কি জানি কি করতে গিয়ে বালতিটা নিজের পায়ে উল্টে দিয়েছে।'

'চু-চু-চু,' জিভ আর টাকরা সহযোগে আওয়াজ করলো সলোমন, চেহারায় সহানুভূতি নিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে রানার দিকে তাকালো। 'দেখো দেখি, কি রকম অসাবধানী লোক!'

কোনো মন্তব্য না করে আর সবার সাথে সামনে এগোলো রানা। দরজার কাছে গাদাগাদি ভিড়, সবার মাথার ওপর দিয়ে তাকালো ও। লিফার মেঝেতে পড়ে ছটফট করছে, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মোচড় খাচ্ছে শরীর। আশপাশ থেকে শুধু নিঃশ্বাসের শব্দ

শুনতে পেলো রানা, কেউ একটা কথাও বলছে না। এই মুহূর্তে ডাক্তারকে পাওয়া গেল না, তবে ফার্স্ট এইড বক্স নিয়ে ছুটে এলো দু'জন পুরুষ নার্স। কিন্তু দশাসই লিফারকে থামানোর উপায় কি! সদ্য গলা কাটা কৈ মাছের মতো সারা ঘরে লাফাচ্ছে দেহটা। ধাক্কা খাওয়ার, বা লেগে যাবার ভয়ে নার্স দু'জনও ছোটো ছোটো লাফ দিয়ে দূরে সরে থাকার চেষ্টা করলো। সাহায্য করার জন্যে ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকলো রানা, কিন্তু ওকে হারিয়ে দিয়ে আগে পৌঁছে গেল সলোমন। চারজনের মিলিত চেষ্টায় কোনোরকমে স্থির করা হলো লিফারকে। ওরা তাকে শক্ত করে চেপে ধরে থাকলো, একজন নার্স একটা ইঞ্জেকশন দিলো।

স্ট্রেচারে তোলা হলো লিফারকে। ইতিমধ্যেই জ্ঞান হারিয়েছে সে।

উপস্থিত সবার প্রতিক্রিয়া খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলো রানা। লিফারের প্রতি কারো কোনো সহানুভূতি নেই। জেলখানায় কয়েদীদের নিজস্ব একটা সমাজ আছে, সমাজের আছে বিশেষ কয়েকটা অলিখিত শর্ত, তারই একটা ভেঙেছে লিফার, ফলে প্রাপ্য সাজাও পেতে হয়েছে তাকে।

আরো অনেক সেপাই এলো। তাদের মধ্যে প্রিন্সিপাল অফিসার ডানিয়েল বুকারও রয়েছে। সে তার হাতের রুলারটা ঠকাস ঠকাস করে বার কয়েক একটা বেঞ্চে ঠুকলো। 'যে যার কাজে ফিরে যাও। আমি কোনো গোলমাল চাই না।' চ্যাপলের দিকে ফিরলো সে। 'এক ঘণ্টার মধ্যে ডেস্কে রিপোর্ট চাই,

মিঃ চ্যাপল। আপনার জায়গায় আরেকজনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' ঘুরে দাঁড়ালো সে, দরজার দিকে এগোলো। দোরগোড়া থেকে আবার বললো, 'আসার সময় নাহিদ শাহকে নিয়ে আসবেন। ওর বোন ওকে দেখতে এসেছে।'

মাসের শেষ বৃহস্পতিবার ভিজিটিং ডে। এক নম্বর ভবনের হল-রুমে রানাকে নিয়ে এলো ডিউটি অফিসার। এরই মধ্যে গিজ গিজ করছে লোকজন। এক দেয়াল থেকে আরেক দেয়াল পর্যন্ত খুপরি আকারের সার সার ঘর, প্রতিটিতে কয়েদী এবং সাক্ষাৎপ্রার্থী পরস্পরের মুখোমুখি বসে, মাঝখানে থাকে আর্মারড্ গ্লাস, কথা হয় মাইক্রোফোনে। সময়সীমা দশ মিনিট।

একটা খুপরিতে ঢুকিয়ে দেয়া হলো রানাকে। পিছনে বন্ধ হয়ে গেল ক্ষুদে কাঁচের দরজা। অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে উঠলো রানা। দু'পাশের খুপরি থেকে হেঁড়ে গলার আওয়াজ আসছে, ভোঁতা গুঞ্জনের মতো, একটা শব্দও পরিষ্কার শোনা যায় না। প্রায় দু'মিনিট পর উল্টোদিকের দরজা খুলে খুপরিতে ঢুকলো একটা মেয়ে। পরনে রঙচটা হালকা নীল জিনস আর লাল শার্ট। চেয়ারে বসেই বললো, 'ও-মা, ওরা তোমার একি অবস্থা করেছে!'

অ্যামপ্লিফায়ারে গলার আওয়াজ ভাঙা ভাঙা শোনালো। একটা ঢোক গিলে হাসলো রানা। 'কেন, এতোই কি খারাপ দেখাচ্ছে?'

'খারাপ ভালো বলছি না, বলছি একেবারে বদলে গেছো

তুমি।'

'সত্যি করে বলো তো, ঠিক কি রকম লাগছে?'

'পচা ছোটোলোক। নীচ গুণ্ডা। শয়তানের হাড্ডি। হিংস্র একটা পশু।'

মাথার চুলে আঙুল চালালো রানা, যেন দুর্ভাবনায় পড়ে গেছে।

'কি হলো?'

'বোধহয় তোমার কথাই সত্যি,' বললো রানা। 'তা না হলে তোমাকে দেখামাত্র বদ চিন্তাগুলো মাথায় কিলবিল করে উঠলো কেন?'

'বদ চিন্তা?' মুখের এমন ভাব করলো সোহানা যেন চিরতার পানি খেয়ে ফেলেছে।

'জানতে চেয়ো না, সে-সব চিন্তা প্রকাশযোগ্য নয়।'

কাঁচের ওদিক থেকে টুকটুকে লাল জিভের ডগা বের করে রানাকে ভেঙচে দিলো সোহানা। 'তুই শালা একটা ইয়ে!'

'টাকার খবর কি?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'বসের মেসেজ এসেছে। তিনি বলেছেন, গরুটাকে মুভ করতে বলো। অনেক দিন তো হলো, জেলখানায় বসে আর কতো ঘাস খাবে!'

'মনে হচ্ছে নতুন কোনো কাজ গছাতে চায়?'

'হতে পারে, ঠিক জানি না,' বললো সোহানা। 'এখানকার খবর বলো।'

'এই মুহূর্তের খবর হলো, পিয়াসী গুলনারকে দারুণ সুন্দরী

দেখাচ্ছে··· ।'

'সত্যি ?'

'সাবধান, বোকার মতো কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসো না, স্রেফ ফেঁসে যাবে তাহলে। জানোই তো, এখান থেকে পালানোর ইচ্ছে আছে আমার।'

'সময় মাত্র দশ মিনিট, মনে আছে ?' হাতঘড়ি দেখলো সোহানা। 'নাকি আসলেই শুধু ঘাস খাচ্ছো, কাজের কাজ কিছুই এগোয়নি ?'

'কি জানতে চাও বলো।'

'তোমার সাথে সলোমনের সম্পর্ক ?'

'ভালো—খুবই ভালো,' বললো রানা। 'এই তো খানিক আগে একটা বিপদে সাহায্য করলাম ওকে। একজন একটা ধারালো জিনিস গাঁথতে যাচ্ছিলো ওর পিঠে, ঠিকমতো লাগলে মারাই যেতো।'

'ওমা, সেকি! জেলখানাতেও মারামারি কাটাকাটি! শুনেছি এ-সব বন্ধ করার জন্যেই লোকজনকে জেলে ভরা হয়।'

'কিন্তু ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও তো ধানই ভানে।'

'কাউন্ট সম্পর্কে কিছু জানতে পারলে ?'

মাথা নাড়লো রানা। 'কয়েদীরা অনেকে তার নাম উচ্চারণ করে, তার বেশি কিছু না। কেউই আসলে লোকটা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না। নানা রকম গল্প আর গুজব শোনা যায় বটে, কিন্তু সবই এক একটা প্রশ্নচিহ্ন।'

'সলোমন কি বলে ?'

'তাকে আমি সরাসরি একটা প্রশ্ন করেছিলাম—শুনেছি, জন হেরিক, রিড কোয়েন, আর রিপ হটনকে নাকি কাউন্ট জেল থেকে বের করে নিয়ে গেছে? শুনে খুব এক চোট হাসলো সে। তার ধারণা, এ-সব নেহাতই কোনো পাগলের প্রলাপ।'

'তারমানে, আসলেও অযথা সময় নষ্ট করছো তুমি?'

'আরে না। সলোমন এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, এ-ব্যাপারে আমি শিওর। কিছু বলেনি, কিন্তু তার আচরণ দেখে টের পেয়েছি।'

'কি রকম?'

'ব্যাখ্যা করা কঠিন,' বললো রানা। 'কিন্তু লক্ষণগুলো চিনতে আমার ভুল হয়নি। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকা, কান খাড়া করে পায়ের শব্দ শোনা, টিকটিকি ডেকে উঠলে চমকে ওঠা, কোনো কারণ ছাড়াই ঠোঁট কামড়ানো—নিশ্চয়ই এ-সবের কোনো মানে আছে।'

'তারমানে তুমি জানো না কবে বা কখন সে পালাবে।'

'না। কোনো সূত্র এখনো পাইনি। তবে যখন ব্যাপারটা ঘটতে শুরু করবে, আমি জানতে পারবো। চোখ-কান খোলা রেখেছি।'

চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লো সোহানা। 'আমার সন্দেহ হচ্ছে, সত্যিই কি কিছু ঘটবে? ফ্রাইডেথর্পের ফাইল পড়েছি আমি। সলোমন পালাতে পারবে না—এখান থেকে পালানো কারো পক্ষে সম্ভব নয়।'

'কিভাবে সম্ভব তা বলতে পারবো না, কিন্তু সলোমন যে

পালাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই,' জোর দিয়ে বললো রানা। 'আর সে পালালে আমিও তার সাথে থাকবো।'

'তোমার প্ল্যানটা কিন্তু আমাকে বলোনি। সাথে থাকবে মানে? কতোদূর সাথে থাকবে? আমার তো ধারণা, ওকে যারা নিতে আসবে তাদের তুমি বাধা দেবে—মানে, আটক করবে।'

'না। সলোমনের সাথে সম্ভবত শেষ মাথা পর্যন্ত থাকতে হবে আমাকে। হাসানের খবর পেতে হলে আর কোনো বিকল্প নেই। তাছাড়া, কাউন্টের কাছে আমাকে পৌঁছুতে হবে না?'

'একা?'

'কেন, শোনোনি, মাসুদ রানা একাই একশো?'

'ঠাট্টা নয়, প্লিজ, রানা,' উদ্বেগের সাথে বললো সোহানা। 'তুমি একা সেজন্যে আমি ভয় পাচ্ছি না। কিন্তু যোগাযোগ না থাকলে জানবো কিভাবে তুমি কোনো বিপদে পড়লে কিনা?'

'যোগাযোগ রাখার কোনো উপায় তো দেখছি না,' বললো রানা। 'আমার ওপর নিশ্চয়ই নজর রাখা হচ্ছে। ঘন ঘন কেউ দেখা করতে এলে সন্দেহ করবে। বেরুবার সময়, এবং পরিবেশ কি রকম হবে আগে থেকে বলা সম্ভব নয়—হয়তো যোগাযোগ করতে পারবো, হয়তো পারবো না।'

অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো সোহানা। 'কিন্তু···।'

'শুধু শুধু দুশ্চিন্তায় না ভুগে যা করলে কাজ হবে সেটা করবে, পরামর্শ দিলো রানা। 'খবরটা কাগজেই পেয়ে যাবে, আমি পালিয়েছি। অমনি অজু করে জায়নামাজে বসে পড়বে···।'

'নামাজ-কালাম নিয়ে ঠাট্টা করবে না।'

সোহানার থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করলো রানা। 'মাফ করে দে।'

ফিক্ করে হেসে ফেললো সোহানা। 'করতে পারি এক শর্তে। নিজের ওপর লক্ষ্য রাখবি।'

'রাজি,' বললো রানা। 'কিন্তু আমারও একটা দাবি আছে।'

'তাড়াতাড়ি বলো,' হাতঘড়ি দেখলো সোহানা। 'কি?'

'শরীরের যত্ন নিবি—বেরিয়ে যখন তোর সাথে দেখা করবো, ঠকতে চাই না। গায়ের গন্ধ, চুমোর স্বাদ, বাহুর বন্ধন, হাতের পরশ, চোখের নাচন, দেহের হিল্লোল—আর কি যেন? সব আগের মতো চাই—টক-মিষ্টি।'

'সব পেতে পারিস শুধু যদি তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস আমার কাছে,' আবার একবার রানাকে ভেঙচালো সোহানা। 'তোর দেরির জন্যে ও-সব নষ্ট হয়ে গেলে আমি দায়ী থাকবো না।'

রানার পিছনে কাঁচের দরজায় টোকা পড়লো। সময় শেষ।

'কথা দিলাম, চেষ্টা করবো,' বলে চেয়ার থেকে নামলো রানা। সোহানাকে উল্টোদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখলো ও।

হঠাৎ বুকটা ওর খালি হয়ে গেল।

নয়

প্রতিটি টাওয়ার ব্লকের তিন তলায় ছোটো একটা করে ক্যানটিন আছে, সেখানেই খাওয়াদাওয়া হয়। রানা পৌঁছে দেখলো, লাঞ্চ শুরু হয়ে গেছে।

দরজার কাছে খাতা নিয়ে বসে আছে এক অফিসার, রানার নামের পাশে টিক্ চিহ্ন দিলো সে, তার কাছ থেকে একটা টিকেট নিয়ে কাউন্টারের সামনে চলে এলো রানা। ট্রে ভরে নিয়ে এদিক ওদিক তাকাতেই দেখতে পেলো সলোমনকে। দেয়াল ঘেঁষে প্রথম টেবিলটায় বসেছে সে, পাশেই একটা খালি চেয়ার, হাতছানি দিয়ে ডাকলো রানাকে।

'লণ্ডনে তাহলে তোমার একটা বোনও আছে, কেমন?' রানা বসতেই জিজ্ঞেস করলো সলোমন। 'তারমানে সব কথা তুমি আমাকে বলোনি।'

উত্তর একটা তৈরি করাই ছিলো। 'ধারণা ছিলো না এতো কিছুর পরও আমার কথা ভাবে ও,' বললো রানা। 'মা-বাপ-

ভাই-বোন, জুলুম তো কারো ওপর কম করিনি, ভেবেছিলাম ওরা আমার কথা ভুলে গেছে।'

'শুনলাম খুবই নাকি সুন্দরী দেখতে।'

চেহারায় একটু গর্বের ভাব ফুটিয়ে তুলতে হলো। 'এমন কিছু আছে কি যা তোমার কানে আসে না?'

'আছে, কিন্তু শোনার মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়,' বললো সলোমন। 'নিশ্চয়ই কোনো আফগান যুবককে ভালোবাসে?'

হেসে ফেললো রানা। পরমুহূর্তে, সলোমনের কথা শুনে, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ও।

'ওর বিয়েতে আমাকে দাওয়াত দিতে পারো,' বললো সলোমন। 'ততোদিনে আমি হয়তো বাইরে থাকবো।' রানা তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে দেখে হাসলো সে। অদ্ভুত রহস্যময় হাসি। তারপর বললো, 'কই, আমি কিছু বলিনি তো।'

লাঞ্চের শেষের দিকে প্রিন্সিপাল অফিসার বুকার এলো ইন্স-পেকশনে, রোজই আসে সে। কয়েক মিনিট পর ঘণ্টা বাজিয়ে পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো। কাউন্টারে ট্রে জমা দেয়ার জন্যে লাইন দিতে হলো সবাইকে, তারপর আরেকবার লাইন দিতে হলো লিফটে চড়ার জন্যে। ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে সেলে ফিরে যাবে কয়েদীরা, বিকেল পর্যন্ত বিশ্রাম, তারপর আবার ওয়র্কশপে শুরু হবে কাজ।

অপেক্ষা করার সময় ধূমপানের অনুমতি আছে। পকেট থেকে সিগারেট বের করলো সলোমন, এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে

দিয়াশলাই বের করতে ব্যর্থ হলো সে। ঠোঁটে সিগারেট, কিন্তু আগুন নেই। পাশে এসে দাঁড়ালো প্রিন্সিপাল অফিসার বুকার, পকেট থেকে দিয়াশলাই বের করে বাড়িয়ে দিলো তার দিকে।

'রাখো এটা, সলোমন, কিন্তু বুঝেশুনে খরচ করো।' মাথা নাড়তে নাড়তে সামনে এগোলো প্রিন্সিপাল অফিসার। 'আমি না থাকলে কি দুর্দশাই যে হতো তোমাদের!'

আশপাশে যারা ছিলো প্রায় সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলো। কেউ কেউ বেশ জোরে হাসলো, বুকারের চোখে ভালো থাকতে চায় তারা। এক মুহূর্ত পর লিফট নামলো। এগোতে শুরু করে ঠোঁট থেকে সিগারেট নামালো সলোমন, তারপর দিয়াশলাই-য়ের সাথে পকেটে রেখে দিলো সেটা।

উত্তেজনার একটা শিহরণ বয়ে গেল রানার শরীরে। গোটা ব্যাপারটা উদ্ভট লেগেছে ওর কাছে, একেবারেই মেলে না। প্রিন্সিপাল অফিসারের সাথে একটুও বনে না সলোমনের। দু'-জনের কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না, এবং বিতৃষ্ণার ভাব-টুকু গোপন করেও রাখে না। অথচ প্রিন্সিপাল অফিসার যেচে পড়ে সলোমনকে সাহায্য করলো! ব্যাপারটা কি?

আবার ওয়র্কশপে কাজে যাবার আগে-পর্যন্ত সেলগুলোর দরজা খোলাই থাকে, আশপাশের সেল থেকে আসা-যাওয়া করে কয়েদীরা, গল্প-গুজব চলে। তবে কেউ যদি ঘুমাতে চায় বা একা থাকতে চায়, ইচ্ছে করলে দরজা বন্ধ করতে পারে সে। রানাকে সাথে নিয়ে সেলে ঢুকেই সলোমন বললো, 'বাইরে তোমার কোনো কাজ আছে?'

মাথা নাড়লো রানা। 'আমি শোবো।'

'তোমার অসুবিধে না হলে দরজাটা তাহলে বন্ধ করে দিই,' বললো সলোমন। রানার উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে দরজা বন্ধ করলো সে। 'আজ আমার মুড নেই যে কারো সাথে কথা বলবো।'

বিছানায় লম্বা হলো রানা। 'কেন, কি হয়েছে, শরীর খারাপ করলো নাকি?'

'এক ধরনের অস্থিরতা বোধ করছি। ইচ্ছে হচ্ছে দেয়াল ভেঙে পাহারায় থাকি কেউ যাতে মেরামত করতে না পারে।'

একটা পত্রিকা খুলে চোখের সামনে মেলে ধরলো রানা। অপেক্ষা করছে।

একটু পর বিছানা থেকে নামলো সলোমন, ওয়াশবেসিনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। রানার দিকে পিছন ফিরে পকেট থেকে দোমড়ানো সিগারেটটা বের করলো সে, ধরালো। দিয়াশলাইটা ওয়াশবেসিনের কিনারায় রাখলো সে।

শার্টের পকেট থেকে রানাও একটা সিগারেট বের করলো। বিছানা থেকে নেমে দ্রুত পায়ে এগোলো ও, হাত বাড়িয়ে দিলো দিয়াশলাইয়ের দিকে। সলোমন তাকিয়ে আছে তার খোলা তালুর দিকে। হাতটা তাড়াতাড়ি মুঠো হয়ে গেল, কিন্তু যা দেখার দেখে নিয়েছে রানা। সলোমনের হাতে ছোটো একটা খয়েরি ক্যাপসুল।

'দিয়াশলাইটা একটু দেবে, সলোমন?'

'হাত বাড়াও,' বললো সলোমন।

বেসিনের কিনার থেকে দিয়াশলাই তুলে নিয়ে সিগারেট ধরালো রানা, সেটা আবার জায়গামতো রেখে ফিরে এলো নিজের বিছানায়। প্রিন্সিপাল অফিসার তাহলে সলোমনের যোগাযোগ? অবাক কাণ্ড! বিশ্বাস করা কঠিন! নিশ্চয়ই মোটা, খুবই মোটা অংকের টাকা খেয়ে এই কাজে নেমেছে বুকার। ঝুঁকিটাও তো ভয়ানক। চুপচাপ শুয়ে থাকলো রানা। ওদিকে প্লাস্টিকের একটা কাপ ভরে ছোটো ছোটো চুমুকে পানি খাচ্ছে সলোমন।

দু'মিনিট পর ফিরে এসে বিছানার কিনারায় বসলো সে। তার চেহারায় অদ্ভুত একটা ভাব স্থির হয়ে আছে।

'সলোমন?' মৃদু কণ্ঠে ডাকলো রানা।

ফিরলো সলোমন, কিন্তু রানাকে দেখতে পেতে তার যেন এক সেকেণ্ড দেরি হলো।

'সত্যিই তোমার শরীর খারাপ লাগছে না? কেমন যেন দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'ও কিছু না,' বললো সলোমন। 'সম্পূর্ণ সুস্থ আছি আমি। সম্ভবত বসন্ত বলেই থেকে থেকে কেমন যেন উদাস হয়ে পড়ছি। বছরের এই সময়টায় এরকম হয় আমার—ভেতরটা ছটফট করতে থাকে।'

'করারই কথা,' সায় দিলো রানা। 'বন্দী জীবন!'

কিন্তু রানার কথা সলোমন শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। অনড় মূর্তির মতো বসে থাকলো সে। দেয়ালে চোখ, অথচ তাকিয়ে আছে যেন বহুদূরে।

রানা আর তাকে বিরক্ত করলো না।

সেদিন এমনিতে গরম পড়েছে, তার ওপর এয়ার সার্কুলেটিং সিস্টেমে গোলযোগ দেখা দেয়ায় বিকেলে ওঅর্কশপে কাজ করতে গিয়ে ঘেমে গোসল হয়ে গেল সবাই। অনেকেই গায়ের জামা খুলে ফেলেছে।

লম্বা একটা বেঞ্চের এক প্রান্তে বসে হ্যাণ্ড গিলোটিন দিয়ে প্লেট কাটছে রানা। সলোমন বসেছে উঁচু একটা স্পীড হুইলের সিটে, ইস্পাতের এক গাদা ক্লিপে শান দিয়ে আকারে ছোটো করছে সেগুলো। বেশ কিছুক্ষণ হলো দরদর করে ঘামছে সে। চোখে চকচকে, ঘোর লাগা দৃষ্টি।

'তোমার খারাপ লাগছে, সলোমন?' জিজ্ঞেস করলো রানা, কিন্তু সলোমন ওর কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না।

একবার কাজ থামিয়ে পিছন দিকে হেলান দিলো সলোমন, অথচ সিটের পিঠ নেই। তাল সামলাবার সময় ঝাঁকি খেলো সে। চোখে ঘাম পড়লো, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঘষে ঘষে মুছলো চোখ দুটো। পাশেই একটা বেঞ্চের ওপর রয়েছে ক্লিপগুলো, ঝুঁকে একটা নিতে গিয়ে দুলতে শুরু করলো সে। পরিষ্কার দেখলো রানা, বাড়ানো হাতটা কাঁপছে। নাগালের মধ্যে, অথচ হাতড়াতে লাগলো, যেন চোখেও ভালো দেখতে পাচ্ছে না। ক্লিপগুলো একটার ওপর একটা, স্তূপ করা। হাতের ধাক্কা লেগে স্তূপটা হুড়মুড় করে পড়ে গেল বেঞ্চ থেকে। ব্যস্তভাবে থাবলা মারলো সলোমন, অন্তত যাতে কিছু ক্লিপ ধরে ফেলতে

পারে। কিভাবে যেন হাতের উল্টোপিঠে লেগে লাফ দিয়ে উঠলো একটা ক্লিপ, পড়লো গ্রাইণ্ডিং মেশিনের ঘুরন্ত চাকায়। বুলেটের মতো ছিটকে গেল সেটা, ঝর্ণার মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো আগুনের ফুলকি।

তারপরই সলোমনের সারা শরীর কাঁপতে শুরু করলো থরথর করে। অদ্ভুত এক টলমলে অবস্থায় সিট থেকে নামতে গেল সে। নিজের অজান্তেই আঁতকে উঠলো রানা, ভয়ংকর একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। গ্রাইণ্ডিং মেশিনে একটু ছোঁয়া লাগতে যা দেরি, সাথে সাথে দু'ফাঁক হয়ে যাবে মাংস। বেঞ্চ ছেড়ে উঠলো রানা, কিন্তু ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছে সলোমন। টলছে সে। কাঁপুনি আগের চেয়ে বেড়েছে। উল্টোদিকে নানা আকৃতির মেশিন, সবগুলো চালু, সেদিকে কাত হতে শুরু করলো সে।

লাফিয়ে উঠলো রানা।

ভাগ্যই বলতে হবে, কাত হয়ে পড়ে যাবার আগে সলোমনের একটা হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল। সময়মতোই পৌঁছুতে পারলো রানা। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ধীরেধীরে মেঝেতে বসালো তাকে।

কপালে উঠে গেছে সলোমনের চোখ। কুলকুল করে ঘামছে সে। হাত আর পায়ে খিঁচুনি উঠে গেছে। কোনো সন্দেহ নেই এটা সেই দ্বিতীয় স্ট্রোক, যার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন গভর্ণর। অভিনয় নয়, নির্ভেজাল অসুস্থতা। স্ট্রোকের লক্ষণগুলো নিখুঁত —না জানলে বিশ্বাস করা কঠিন ড্রাগের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

এরপর কি হবে জানা আছে। এখুনি অ্যাম্বুলেন্স চলে আসবে। ম্যানিংহ্যাম জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে সলোমন-

কে। তারপর···তারপর কি ?

তারপর কি জানতে হলে সলোমনের সাথে যেতে হবে রানাকে।

কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ ওকে পাঠাবে না। যাতে পাঠায় তার ব্যবস্থা ওকেই করতে হবে।

মেশিন শপের চারদিক থেকে হৈ-চৈ করে উঠলো কয়েদীরা। ছুটে এলো সবাই। আবার একটা ঝাঁকি খেলো সলোমন, ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়লো রানা। চেষ্টা করলে তাল সামলে নিতে পারতো ও, কিন্তু চেষ্টা করলো না। সলোমনের সাথে যাবার সম্ভাব্য এই একটা রাস্তাই খোলা আছে, তাল হারিয়ে বেঞ্চে ঘষা খেলো রানা, তারপর কাত হয়ে পড়লো গ্রাইণ্ডিং মেশিনের দিকে।

বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপরটা লম্বালম্বিভাবে পলকের জন্যে ঠেকলো মেশিনে, নয় ইঞ্চি মাংস ফাঁক হয়ে গেল সাথে সাথে। রক্তের দর্শনীয় এবং সন্তোষজনক একটা স্রোত বেরিয়ে ভাসিয়ে দিল বেঞ্চটা।

আহত জায়গাটা চেপে ধরে মেঝেতে ঢলে পড়লো রানা। সলোমনকে ছেড়ে দেয়ায় সে-ও ঢলে পড়তে শুরু করলো। ছুটে এসে তাকে ধরে ফেললো হানিকাট। আশ্চর্য, রানা কোনো ব্যথা অনুভব করলো না। মেঝেতে শুয়ে লোকজনের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে থাকলো ও, যেন কিভাবে কি ঘটলো কিছুই বুঝতে পারছে না।

কিছুক্ষণের জন্যে উপস্থিত সবার মধ্যেই একটা দিশেহারা ভাব

দেখা গেল। চারদিকে ব্যস্ত ছুটোছুটি, চেঁচামেচি। আনাড়ি এক লোক হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে হড় হড় করে রানার মাথায় পানি ঢালতে শুরু করলো। গ্রাইণ্ডিং মেশিনটা তখনও চলছে, বন্ধ করার কথা কারো মাথায় আসেনি। কয়েক মুহূর্ত পর দু'ফাঁক হয়ে গেল ভিড়টা, হন হন করে হেঁটে এলো প্রিন্সিপাল অফিসার বুকার।

'ডাকাত পড়েছে নাকি, অ্যাঁ? এতো কিসের গোলমাল শুনি? সরো, দেখতে দাও আমাকে।' ডিউটি অফিসারকে ধাক্কা দিয়ে তার পাশে দাঁড়ালো বুকার।

'সলোমনের আবার স্ট্রোক হয়েছে। নাহিদ না ধরলে ঢুকে যেতো মেশিনের ভেতর।'

রক্তের স্রোত দেখে সাদা হয়ে গেল বুকারের চেহারা। 'মাই গড, এমন রক্তারক্তি কাণ্ড হলো কি করে!'

'ধাক্কা খেয়ে গ্রাইণ্ডিং মেশিনের ওপর পড়েছিল।'

হাঁটু মুড়ে বসে সলোমনকে পরীক্ষা করলো বুকার। ঠোঁট উল্টে অসহায় একটা ভঙ্গি করলো সে, সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে ডিউটি অফিসারের দিকে ফিরলো। 'সিক বে থেকে একজোড়া স্ট্রেচার আনাও, জলদি! ওদের বলো ম্যানিংহ্যাম হাসপাতালে ফোন করুক। বলো সলোমনের এটা দ্বিতীয় স্ট্রোক, আমরা রওনা হয়ে গেছি।'

'আর নাহিদ?'

'সে-ও যাচ্ছে। অথম গুরুতর, এখানে কিছু করা যাবে না। অন্তত বারোটা সেলাই লাগবে হাতে। যাও!'

আশ্চর্যই বলতে হবে, ঠিক এই সময় শুরু হলো ব্যথাটা, অসহ্য যন্ত্রণায় চোখে অন্ধকার দেখলো রানা। তারপর ওর আর কিছু মনে নেই।

দশ

চোখ মেলার পর রানা শুধু মাকড়সার জাল দেখতে পেলো। বিশাল আকারের সব মাকড়সার জাল, খয়েরি, এক দেয়াল থেকে আরেক দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত, ধীর ভঙ্গিতে সামনে পিছনে নড়াচড়া করছে। চোখ বন্ধ করে মাথাচাড়া দিতে থাকা আতংকের সাথে যুঝলো ও। তারপর আবার যখন চোখ মেললো প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে জালগুলো।

হাসপাতালের সরু একটা বিছানায় শুয়ে আছে ও। বাঁ হাতটা নেই।

মাথা একটু কাত করে পাশে তাকালো রানা। যেখানটায় বাঁ হাত থাকার কথা সেখানে মোটা ব্যাণ্ডেজ দেখলো, কিন্তু কাঁধের কাছ থেকে নিচের দিকে কোনো অনুভূতি নেই। ঝট্ করে

সব কথা মনে পড়ে গেল ওর। কামরার চারদিকে চোখ বুলালো।

ছোটো একটা ওয়ার্ড, ছ'টা বেড, তিনটেই খালি। একটায় রয়েছে লিফার, পা জোড়ার ওপর একটা খাঁচা নিয়ে শুয়ে আছে সে। অপর বেডে রয়েছে সলোমন। দু'জনেই হয় ঘুমিয়ে আছে, নয়তো জ্ঞান নেই।

দরজার কাছে ছোটো একটা টেবিল, দু'জন প্রিজন অফিসার তাস খেলছে। রানা নড়ে উঠতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো তারা, খেলা ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে এলো একজন। 'কেমন লাগছে তোমার?'

'পুলক,' বললো রানা। মনে মনে ভাবলো, সলোমনের সাথে অন্তত হাসপাতাল পর্যন্ত আসতে পেরেছি, এটা কি কম সাফল্য? শরীরের অবস্থা যাই হোক, মনটা তো পুলকিত হওয়ারই কথা। 'এখানে নিয়ে আসার পর কি ঘটলো জানো?'

'ডাক্তার অ্যানেসথেটিক দেয়, তারপর সেলাই করে।' সঙ্গীর দিকে ফিরলো প্রিজন অফিসার। 'ডাক্তারকে খবর দাও। জানাতে বলে গেছে।'

ক্লান্তিতে গোটা শরীর যেন অবশ হয়ে আসছে, চোখ বন্ধ করলো রানা। মাথার ভেতরটা হালকা আর খালি খালি লাগলো। ঢোক গিলেও মুখের ভেতরটা ভেজানো যাচ্ছে না, শুকনো নিউজপ্রিন্ট হয়ে আছে। প্রিজন অফিসার টেলিফোনে কথা বলছে, যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে আওয়াজটা। চোখ খুলে আবার একবার হাতটার দিকে তাকালো রানা। একেবারে কিছুই অনুভব করছে না, তা নয়। অদ্ভুত একটা অসাড়

ভার। হাতটার যেন তিন শো মন ওজন, এক চুল নাড়াবার শক্তি নেই। এতো ভারি লাগার কারণ, উপলব্ধি করলো রানা, পেইন-কিলিং ইঞ্জেকশন দেয়া হয়েছে। ব্যাণ্ডেজের ভেতর হাতের অবস্থা কতোটা খারাপ জানার কোনো উপায় নেই।

মেশিন শপে ঝুঁকিটা কিন্তু মারাত্মক নিয়েছিল সে। যদি একটা টেনডন ছিঁড়ে যেতো? আবার চোখ বুজলো রানা, কপালে ঘাম ফুটে উঠছে।

দরজা খোলার আওয়াজে চোখ খুললো ও।

ডাক্তার একজন আফ্রিকান, নিগ্রো। চেহারায় আদিবাসী একটা ভাব আছে, সম্ভবত নাইজেরিয়ান। ছ'ফুটের বেশি লম্বা, চোখে বুদ্ধির ঝিলিক, হাসি হাসি মুখ। রানার চোখে চোখ রেখে একটা হাত নাড়লো সে, বললো, 'হাই!'

বিছানার কিনারায় বসলো ডাক্তার। রানার হাত ধরে পালস পরীক্ষা করলো। 'কি রকম বোধ করছেন?'

'মাথার ভেতরটা হালকা, আর গলা শুকিয়ে কাঠ।'

'স্রেফ অ্যানেসথেটিকের আফটার-এফেক্টস। দুশ্চিন্তার কোনো ব্যাপারই নয়।' বেডসাইড লকার থেকে জগ ভর্তি পানি বের করে একটা গ্লাসে ঢাললো ডাক্তার। 'ঢক ঢক করে এটুকু খেয়ে ফেলুন, দেখবেন আগের চেয়ে অনেক ভালো লাগবে।'

পানি খেয়ে আবার শুলো রানা। 'হাতটার কি অবস্থা—খুব কি খারাপ?'

মাথা নাড়তে নাড়তে নিঃশব্দে হাসলো ডাক্তার। 'টেলি-ভিশনে কি যেন বলে—আবার আপনি বেহালা বাজাতে পার-

বেন। আচ্ছা, আপনার মধ্যে কুসংস্কার আছে? আপনি মনে করেন তেরো একটা অশুভ সংখ্যা?'

'কেন বলুন তো?'

'না, তেরোটা সেলাই পড়েছে কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছি।' হাসছে ডাক্তার। 'কি করবো বলুন, আরেকটা সেলাইয়ের জায়গা ছিলো না।'

'এবার তাহলে আমাকে ফেরত পাঠাবেন?'

'ফ্রাইডেথর্পে?' উত্তর দেয়ার সময় ডাক্তারের চেহারায় সহানুভূতির কাছাকাছি একটা ভাব ফুটে উঠলো, 'এখুনি না। হাতটার ওপর আরো দু'চার দিন নজর রাখতে চাই আমি।'

স্বস্তির ভাবটুকু চেপে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করলো রানা, কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় তা সম্ভব হলো না। 'সলোমনের অবস্থা কি রকম বুঝছেন?' জিজ্ঞেস করলো ও। 'সিরিয়াস?'

চেহারা ম্লান হয়ে গেল ডাক্তারের, কাঁধ ঝাঁকালো সে। 'দ্বিতীয় স্ট্রোক—সিরিয়াস তো বটেই। কাল টেস্টগুলো করার পর আরো ভালো বোঝা যাবে। কথা তো অনেক হলো, এবার আপনাকে ঘুমাতে হবে।'

ডাক্তার বেরিয়ে গেল, সাথে সাথে ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। প্রিজন অফিসাররা দু'জন এক সাথে এগিয়ে এসে সলোমন আর লিফারকে একবার দেখে গেল, তারপর আবার তাস নিয়ে বসলো।

ঘাড় ফিরিয়ে সলোমনের দিকে তাকালো রানা। শান্তভাবে ঘুমাচ্ছে সে, ঘুমন্ত চেহারায় অদ্ভুত একটা সরলতা ফুটে রয়েছে।

গভীর একটা শ্বাস টানলো রানা। এখন তাহলে কি?

মঞ্চ তো তৈরি। পরবর্তী দৃশ্য কি হবে?

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লো ও।

এরপর যখন ঘুম ভাঙলো তখন রাত। ওয়ার্ডের ভেতর ম্লান আলো আর গাঢ় ছায়া। বন্ধ জানালার কাঁচে অনবরত আঘাত হানছে ক্ষুদে বর্শা আকৃতির বৃষ্টির ফোঁটা। চোখ মেলেই রানা লক্ষ্য করলো খালি বিছানার সংখ্যা এখন আর তিনটে নয়, দুটো। অপরটায় একজন প্রিজন অফিসার শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার সঙ্গী লোকটা জেগে আছে, টেবিলে বসে একমনে পত্রিকা পড়ছে।

রানা মাথা তুলতেই তাকালো সে। 'কেমন আছো হে?'

বিছানায় উঠে বসলো রানা। মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'বোধ হয় ভালো, ঠিক বুঝতে পারছি না। দেখি হাঁটতে পারি কিনা।'

প্রিজন অফিসারের শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল। তবে চেয়ার ছেড়ে উঠলো না সে, বা আপত্তিও জানালো না। পা জোড়া বিছানা থেকে নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিলো রানা, ওভাবে বসে থাকলো কিছুক্ষণ। তারপর মেঝের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালো। প্রায় স্থির ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে দেখে সামনে পা বাড়ালো ও। ধীরে ধীরে হেঁটে ওয়ার্ডের আরেক প্রান্তে চলে এলো, ওয়াশবেসিনের সামনে। ক্লান্ত, হালকা লাগছে শরীরটা, তবে আর কোনো অসুবিধে নেই। ফেরার সময় আগের চেয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারলো রানা, একটুও হাঁপালো না।

ফিরে এসে বিছানার কিনারায় বসলো, তারপর হঠাৎ করেই

উপলব্ধি করলো, বিস্ময়ের একটা ধাক্কার সাথে, ওর দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রয়েছে সলোমন। রানা যেন এক আজব প্রাণী, দু'জন একই ঘরে রয়েছে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না সে। তারপর তার ভুরু জোড়া ধীরে ধীরে কুঁচকে উঠলো। বিছানা থেকে নেমে এগোলো রানা, একটা চেয়ার টেনে সলোমনের পাশে বসলো। 'তোমার শরীর এখন কেমন, জো?'

'এসব কি?' সলোমন হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো রানার দিকে। 'কি ঘটছে এখানে?'

'ম্যানিংহ্যাম জেনারেলের সীল করা একটা ওয়ার্ডে রয়েছো তুমি,' বললো রানা। 'আরেকবার স্ট্রোক হয়েছিল তোমার।'

'তুমি? তুমি এখানে কি করছো?'

'ফ্রাইডেথর্পের মেশিন শপে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে তুমি,' মনে করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলো রানা। 'কাত হয়ে মেশিনারির ওপর পড়তে যাচ্ছিলে, আমি তোমাকে ধরে ফেলি। তারপর তোমার ধাক্কা খেয়ে গ্রাইণ্ডিং মেশিনের ওপর পড়ে যাই। কিছুই তোমার মনে পড়ছে না?'

রানার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতের দিকে তাকালো সলোমন। 'শুধু হাতে লেগেছে?'

মাথা ঝাঁকালো রানা।

'কি অবস্থা?'

'তেরোটা সেলাই। আরো খারাপ হতে পারতো। ওরা বোধহয় আরো দু'দিন এখানে রাখবে আমাকে।'

দ্রুত একটা ফোন করে ওদের কাছে চলে এলো প্রিজন অফিসার। 'ডাক্তারকে খবর দিয়েছি। কেমন লাগছে শরীর?'

'রাক্ষসের মতো খিদে পেয়েছে,' বললো সলোমন। 'যা হোক কিছু একটা দাও।'

মাথা নাড়লো প্রিজন অফিসার। 'আগে শুনি ডাক্তার কি বলে।'

এক মুহূর্ত পর নক হলো দরজায়। ডাক্তার।

প্রিজন অফিসার দরজা খুলে দিলো। ভেতরে ঢুকে হন হন করে এগিয়ে এলো নাইজেরিয়ান আদিবাসী। বিছানায় বসে ভালো করে পরীক্ষা করলো সলোমনকে। হাসি ফুটলো তার মুখে। 'গুড—ভেরি গুড। ভালো ঘুম হওয়ায় একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেছে শরীর।'

'একটা শুয়োর, আর একটা খাসি দরকার,' বললো রানা। 'হাসবেন না, সত্যি দরকার।'

'এর মানে কি আপনাদের খিদে পেয়েছে?' ডাক্তারের দু'সারি দাঁত টিউব লাইটের মতো আলোকিত।

'ভীষণ।'

'দেখি কি করতে পারি,' বললো ডাক্তার। 'কিন্তু বসে থাকা চলবে না, দু'জনেই শুয়ে পড়ুন।' প্রিজন অফিসারের দিকে ফিরলো সে। 'মিঃ ম্যালকম, কিচেনে বলে যাচ্ছি আমি, ওদের কেউ খাবার নিয়ে আসবে। ভালো কথা, আমার ডিউটি শেষ হয়ে যাচ্ছে, তবে আমার কলিগ ডঃ টেনিসন যে-কোনো মুহূর্তে পৌঁছে যাবেন। তিনি নিজেই একবার টহল দিতে আসবেন, তবে

তার আগে তাঁকে যদি দরকার হয় সিস্টারকে ফোন করলেই পৌঁছে যাবেন তিনি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে প্রিজন অফিসার ম্যালকম বললো, 'ঠিক আছে।'

দরজা বন্ধ করে একটা হাই তুললো সে, হাত দিয়ে লাল চোখ জোড়া ডলতে ডলতে দুই বিছানার মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। সলোমনকে জিজ্ঞেস করলো সে, 'তোমার কিছু লাগবে?' ম্যালকমের বয়স হয়েছে, পঁয়তাল্লিশের কম নয়। সহকারীরা সবাই তাকে একটু নরম বলে জানে। হাঁটাচলার মধ্যে শ্লথ একটা ভাব।

'আমার একবার ওয়াশরুমে যাওয়া দরকার,' বললো সলোমন। 'বেডপ্যান চিরকাল ঘেন্না করি আমি। নাহিদের সাথে আপনিও আমাকে একটু ধরুন না, চেষ্টা করে দেখি যেতে পারি কিনা।'

সলোমনের বাঁ দিকে থাকলো রানা, ডান হাতটা ব্যবহার করবে। ম্যালকম থাকলো ডান দিকে। মাঝখানে সলোমনকে নিয়ে এগোবার জন্যে তৈরি হলো ওরা। অথর্ব একটা বুড়োর মতো ধীরে ধীরে হাঁটলো সলোমন, তার প্রায় সবটুকু ভার ওদেরকে বইতে হলো। রানা জানে, সলোমন ধোঁকা দিচ্ছে, অথচ ফেরার সময় চিটচিটে ঘাম দেখা গেল তার কপালে। বিছানায় বসে ঘনঘন হাঁপাতে লাগলো সে। সাংঘাতিক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

ওষুধের প্রতিক্রিয়া?

আবার টোকা পড়লো দরজায়। 'নার্স,' পুরুষকণ্ঠ।

দরজা খুলে দিলো প্রিজন অফিসার ম্যালকম। একটা ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে ভেতরে ঢুকলো নার্স। শূকরও নয়, খাসিও নয়, —পোচ করা মুরগীর ডিম, মাখন লাগানো রুটি, আর চা নিয়ে এসেছে! ট্রলি রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে। খেতে বসে সলোমনের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখলো রানা। কথা বলার আগ্রহ নেই লোকটার, খেলো আস্তে-ধীরে, ভাব দেখালো এখনো ভীষণ ক্লান্ত। অথচ তারপরও তার হাবভাবে অদ্ভুত একটা উত্তেজনার ভাব। ম্যালকমের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ইলেকট্রিক দেয়াল-ঘড়ির দিকে বার কয়েক তাকালো সে।

রানার অনেক পরে খাওয়া শেষ করলো সলোমন। ট্রলিটা দরজার কাছে রেখে গেছে নার্স, ট্রে-গুলো সেটার ওপর তুলে দিয়ে এলো ম্যালকম।

'একটা সিগারেট হবে নাকি, মিঃ ম্যালকম?' জিজ্ঞেস করলো সলোমন।

চেহারায় দ্বিধা নিয়ে মাথা নাড়লো প্রিজন অফিসার। 'উঁহুঁ,' বললো সে। 'ধূমপান তোমার জন্যে হারাম।'

'একটা সিগারেট দু'জন খাবো—দুটোর বেশি টান দেবো না,' বললো সলোমন। 'সারা জীবন খেয়ে এলাম, দুটো টান দিলে মরবো না।'

'তা মরবে না, কিন্তু···।'

'ডাক্তার বকবে আপনাকে?' গলা খাদে নামিয়ে সমাধান জানিয়ে দিলো সলোমন, 'দরজায় নক হলে নিভিয়ে ফেলবো। ধোঁয়া দেখে কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবেন আপনি খাচ্ছিলেন।'

হেসে ফেললো ম্যালকম। দয়ার শরীর, দু'জনকে একটা করে দিলো সে। দিয়াশলাই জ্বেলে ধরিয়েও দিলো। তারপর টেবিলে ফিরে গিয়ে পত্রিকা নিয়ে বসলো।

ন'টা বাজতে পাঁচ মিনিট তখন। কোথাও কোনো আওয়াজ নেই, নেই কোনো অস্থিরতা, অথচ রানার মনে হতে লাগলো যে-কোনো মুহূর্তে প্রচণ্ড উত্তেজনার চাপে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে পারে পরিবেশটা। ওরা যেন টাইম সেট করা বোমার ওপর বসে আছে, বিস্ফোরণের নির্দিষ্ট সেকেণ্ড উপস্থিত, এই বুঝি ফাটলো।

বিছানায় পিঠ দিয়ে শুয়ে আছে সলোমন। চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে সিলিঙে। আঙুলের ফাঁকে আলগা হয়ে রয়েছে সিগারেট, হাতটা যতোবারই সে মুখের সামনে তুললো একটু একটু কাঁপতে দেখলো রানা। লোকটা যে ভেতরে ভেতরে দারুণ উত্তেজিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ন'টা বাজতে আড়াই মিনিট।

রানাকে একবার দেখে নিয়ে আবার সিলিঙের দিকে তাকালো সলোমন।

'কিছু বলবে নাকি?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো রানা।

সলোমন নড়লো না, রানার কথা যেন শুনতে পায়নি।

ন'টা বাজতে দু'মিনিট।

'সময় থাকতে,' সিলিঙের দিকে চোখ রেখেই রানাকে বললো সলোমন, 'জানিয়ে রাখি, তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, নাহিদ। মেশিনশপে আমার উপকার করেছো। প্রথমে লিফারকে ঠেকালে, তারপর সময় মতো ছুটে এসে আমাকে ধরলে। সত্যি ঋণী হয়ে

থাকলাম তোমার কাছে।'

'ও কিছু না।'

'অন্তর দিয়ে অনুভব করি, তোমার জন্যে কিছু করা দরকার আমার,' আবার বললো সলোমন, 'কারো কাছে ঋণী থাকা আমার একেবারেই পছন্দ নয়। কিন্তু কোনো সুযোগই নেই। যাই ঘটুক, আমি চাই আমার এই মনোভাবটুকু উপলব্ধি করো তুমি।'

'কি বলছো কিছুই তো বুঝতে পারছি না!'

সলোমন উত্তর দেয়ার আগেই দরজায় নক হলো।

প্রথমে দরজার চেইন খুললো ম্যালকম। 'কে?'

'আমি,' মার্জিত একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল বাইরে থেকে। 'ডঃ টেনিসন।'

তালা খুলে একপাশে সরে দাঁড়ালো ম্যালকম।

লোকটার পরনে সাদা কোট, কোটের একটা পকেট থেকে অফিশিয়াল সার্টিফিকেটের মতো ঝুলছে স্টেথোস্কোপ। ম্লান, সরু চেহারা, চেহারায় মিটিমিটি হাসিটুকু স্থির হয়ে আছে, যেন সেলাই করা। হাসিটা দেখে মনে হতে পারে লোকটা যেন অনেক আগেই বুঝে নিয়েছে জীবন একটা বাজে কৌতুক বৈ কিছু নয়।

চেহারার মধ্যে আভিজাত্যের একটা ভাব ধরে রাখার চেষ্টা আছে, কিন্তু রানার চোখকে ফাঁকি দিতে পারলো না সে—এক-বার চোখ বুলিয়েই বুঝে নিলো ও, লোকটা অপরাধ জগতের বাসিন্দা, একজন প্রফেশনাল। সেই সাথে এক ধরনের সতর্কতা

অনুভব করলো ও, বিপজ্জনক চরিত্র, সাবধান থাকতে হবে।

'এখানের খবরাখবর সব তাহলে ভালো?' হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে দিয়ে বললো লোকটা। সলোমনের দিকে নয়, রানার দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে একটা চোখ টিপলো সে। রানা লক্ষ্য করলো, সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লেও লোকটার চোখ দুটো হাসছে না। ঘরের দিকে পিছন ফিরে দরজা বন্ধ করছে ম্যালকম, টেনিসনের হাতে একটা পয়েন্ট থ্রি-এইট বেরিয়ে এলো। হাসতে হাসতেই ম্যালকমের খুলির গোড়ায় উল্টো করা অটোমেটিক দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করলো সে।

গুঙিয়ে উঠে দড়াম করে মেঝেতে পড়ে গেল ম্যালকম।

তারপরই শোনা গেল চাপা একটা হুংকার। ঘুম ভেঙে গেছে দ্বিতীয় প্রিজন অফিসারের। লাফ দিয়ে হুংকার ছেড়েছে সে। টেনিসন আওয়াজটা শুনলো, কিন্তু ঘুরে দাঁড়াবার সময় পেলো না, শূন্য থেকে ব্যাঙের আকৃতি নিয়ে তার পিঠে সওয়ার হলো প্রিজন অফিসার।

আশ্চর্য, ছদ্মবেশী ডাক্তার আছাড় খেলো না। প্রিজন অফিসারকে পিঠে নিয়েই এলোমেলো পায়ে টলতে টলতে খানিকটা এগোলো, ঠকাস করে কপালটা ঠুকে গেল দেয়ালের সাথে।

সেই ধাক্কায় হাতের অটোমেটিক খসে পড়লো। মেঝেতে ঘষা খেয়ে ঘরের আরেক দিকে চলে গেল সেটা। তারপর আছাড় খেলো দু'জনেই। ডাক্তারের ঘাড়ের ওপর প্রিজন অফিসার। লাফ দিয়ে এগোলো সলোমন।

খাবলা দিয়ে প্রিজন অফিসারকে ধরলো সে, হ্যাঁচকা টান

দিয়ে তুলে আনলো ডাক্তারের ঘাড় থেকে। আরেক হ্যাচকা টানে শূন্যে তুললো, তারপর ছুঁড়ে দিলো দেয়াল লক্ষ্য করে। সলোমনের গায়ের জোর হতভম্ব করে দিলো রানাকে। দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে পড়লো প্রিজন অফিসার, ছুটে গিয়ে দমাদম তার মাথায় আর ঘাড়ে কয়েকটা লাথি মারলো সলোমন। মানুষ নয়, হিংস্র পশুর মতো লাগলো তাকে। থামছে না, অথচ অফিসার আগেই জ্ঞান হারিয়েছে।

সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে সলোমনের একটা হাত ধরে ফেলে বাধা দিলো টেনিসন। 'খুন-টুন যদি করতে হয়, সেজন্যে আমিই তো আছি, বুড়ো খোকা—ক্ষ্যামা দাও।'

মনে মনে বিস্ময় মানলো রানা। সলোমন একটু হাঁপাচ্ছে না পর্যন্ত।

'শালা আরেকটু হলে দিয়েছিল সব গোলমাল করে।' প্রিজন অফিসারকে শেষ একটা লাথি মেরে হাসতে লাগলো সলোমন। 'ভুলটা অবশ্য আমারই—ওর দিকে একটা চোখ রাখা উচিত ছিলো।'

'আমি কোনো অভিযোগ করছি না, বুড়ো খোকা!' টেনিসন এখনো হাঁপাচ্ছে।

'জাদু দেখিয়ে দিলে হে,' সলোমনকে বললো রানা। 'স্ট্রোক হবার পর এতো তাড়াতাড়ি কেউ সুস্থ হতে পারে, আমার ধারণা ছিলো না।' মুচকি হাসলো ও। 'আমি বলবো, মেশিন শপে যে অভিনয় দেখিয়েছো তোমার অস্কার পাওয়া উচিত।' তিন কি চার ফিট দূরে দাঁড়িয়ে আছে রানা, সলোমন যখন ঘাড়

ফিরিয়ে ওর দিকে তাকালো, ওর হাত দুটো তখন পিছনে।

'অভিনয়? আরে না, অভিনয় কেন হতে যাবে! সমস্ত কৃতিত্ব মাবোফাইন নামে একটা ওষুধের। স্ট্রোকের সমস্ত লক্ষণ থাকবে, কিন্তু আফটার-এফেক্টস থাকবে না।'

এমন মুখভঙ্গি করলো রানা যেন দারুণ প্রভাবিত হয়েছে। 'সত্যি এ-ধরনের প্ল্যানের তুলনা হয় না।'

'উপভোগ্য সংলাপ,' ওদেরকে বাধা দিয়ে বললো টেনিসন। 'কিন্তু জীবন আর সময়ের দর এই মুহূর্তে সমান। এখুনি আমাদের কেটে পড়া উচিত।'

'আমার কোনো আপত্তি নেই,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো রানা।

মিটিমিটি হেসে ধৈর্যের পরিচয় দিলো ডাক্তার। 'দুঃখিত, বুড়ো খোকা, এবারের সুযোগটা তুমি কাজে লাগাতে পারছো না। শুধু একজনের জন্যে আমাদের ভাড়া করা হয়েছে।'

'আসলেও তাই, নাহিদ,' বললো সলোমন। 'মোটা টাকা ছাড়া ওরা কাউকে সাহায্য করে না।'

পিছন থেকে হাতটা সামনে আনলো রানা, টেনিসনের অটোমেটিকটা তাক করলো ওদের দিকে। 'এটা কি বলছে শুনতে পাচ্ছো না? হয় আমরা সবাই যাবো, নাহয় কেউ যাবে না।'

টেনিসনের সঙ্গের সাথী মিটি মিটি হাসি অদৃশ্য হলো, ঝোঁকের মাথায় এক পা সামনে বাড়লো সে।

দ্রুত সাবধান করলো সলোমন, 'করো কি!' দিশেহারা বোধ করছে সে, মনে দ্বিধা। 'ও সিরিয়াস!'

টেনিসন কাঁধ ঝাঁকালো। 'কাউন্ট ব্যাপারটা পছন্দ করবেন

না।'

'তোমার কাউন্ট তো টাকার ভুখা,' বললো সলোমন। 'ওর জন্যে আলাদা বিল করবে সে, ব্যস, চুকে গেল। তাড়াতাড়ি বলো এবার, এখান থেকে বেরুবো কিভাবে?'

'টাকা অবশ্য কথা বলে, তা সত্যি।' টেনিসনের ঠোঁটে মিটি মিটি হাসিটা ফিরে এলো আবার। দরজা খুলে বাইরে তাকালো সে, তারপর বাইরের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে রাখা হুইল চেয়ারটাকে টেনে ভেতরে ঢোকালো। 'কারো সাথে দেখা হলে তার চোখে ধুলো দেয়া যাবে। করিডরের শেষ মাথায় এলিভেটর, বেসমেন্টে নামবো,' বেরোবো স্টাফ এন্ট্রান্স দিয়ে। এতো রাতে কেউ কোথাও নেই। বাইরে গাড়ি আর কাপড়-চোপড় আছে, কিন্তু একজনের জন্যে।' রানার দিকে তাকালো সে। 'হাসপাতালের ছাপ মারা পা'জামা আর ড্রেসিং গাউন পরে কতো দূরে যেতে পারবে তুমি আমি জানি না।'

'ওটা কোনো সমস্যাই নয়,' বললো রানা। ইঙ্গিতে ম্যালকমকে দেখালো ও। 'লম্বা-চওড়ায় আমরা দু'জন প্রায় সমান। ওর সব খুলে নাও। ইউনিফর্ম জ্যাকেট লাগবে না, শুধু ট্রাউজার, শার্ট, আর পুলওভার।'

কেউ আর কথা বাড়ালো না। দু'মিনিট পর কাপড়গুলো রানার দিকে ছুঁড়ে দিলো সলোমন। ওয়ার্ডের আরেকপ্রান্তে সরে গেল রানা, নাগালের মধ্যে পিস্তলটা রেখে দ্রুত পরে নিলো ওগুলো। 'ভেবো না তোমাকে আমি অবিশ্বাস করি, সলোমন,' ব্যাখ্যা করলো ও। 'কিন্তু আমি জানি, আমার

জন্যে তোমার এই পালানোর সুযোগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে মনে হলে স্রেফ আমার গলা কাটবে তুমি।'

নাক দিয়ে ভোঁতা একটা আওয়াজ করলো সলোমন, এদিক ওদিক মাথা নাড়লো, চেহারায় উদার প্রশংসার ভাব। 'দুঃখ এই যে তোমার সাথে ক'বছর আগে আমার দেখা হয়নি, নাহিদ। দু'জন মিলে কি না করতে পারতাম!'

হুইল চেয়ারে বসলো সে, ঝুঁকে পায়ের ওপর টেনে দিলো চাদরটা। গায়ের কোট খুলে রানার দিকে ছুঁড়ে দিলো টেনিসন। 'এটা পরে হুইলচেয়ার ঠেলবে। আমি একহাতে স্টেথোস্কোপ দোলাবো।'

'ওদের দু'জনকে বাঁধবে না?'

'লাভ কি! আসল টেনিসন যে-কোনো মুহূর্তে এসে পড়বে। চলো-চলো, আর দেরি নয়। সময় এদিক ওদিক হয়ে গেলে বিপদে পড়তে হবে।'

'তোমার নামটা তো জানা হলো না,' বললো রানা। 'কেউ তোমাকে অন্য কারো নামে ডাকলে তুমি অস্বস্তিবোধ করো না?'

'না, কেন অস্বস্তিবোধ করবো? নামে কি আসে যায়? তুমি আমাকে যে-কোনো নামে ডাকতে পারো।' মিটি মিটি হেসে দরজার দিকে এগোলো টেনিসন। 'তবে একান্তই যদি নির্দিষ্ট একটা নামে ডাকতে চাও··· জনি হলে কেমন হয়? নামটা সুন্দর, না? কেউ আমাকে জনি বলে ডাকুক এ আমার অনেক দিনের ইচ্ছে।'

মুখ হাঁড়ি করে সলোমন বললো, 'কে বলবে ক্ষুরের ওপর

দিয়ে হাঁটছি আমরা!'

খালি করিডর। এলিভেটর পর্যন্ত নিরাপদে চলে এলো ওরা, কিছুই ঘটলো না। বোতামে চাপ দিলো জনি, নিচ থেকে উঠে এলো এলিভেটর। বেসমেন্টে পৌঁছে খুলে গেল দরজা, কোনোরকম ইতস্তত না করে বেরিয়ে এলো জনি, হুইলচেয়ার নিয়ে পিছনে থাকলো রানা।

প্রায় খালিই বলা চলে বেসমেন্ট, লোডিং বে-তে শুধু দুটো অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও কিছু নড়ছে না। শেষ মাথায় পৌঁছুলো ওরা, কারো সাথে দেখা হলো না। সামনে দরজা, ধুণ্ড স্টাফরা ব্যবহার করে। বেরিয়ে এলো ওরা বাইরে।

পোর্চের ওপর নগ্ন একটা বাল্ব জ্বলছে। বাল্বের হলদেটে আলোয় বৃষ্টির সূক্ষ্ম কণাগুলো ঝিলমিল করছে। ধাপগুলোর নিচে একটা পুরনো ভ্যান দাঁড়িয়ে রয়েছে। পোর্চ থেকে নামার আগে উঁকি দিলো জনি। দু'জন নার্স, মাথায় বৃষ্টি নিয়ে গাড়ি-পথ ধরে মেইন গেটের দিকে ছুটছে। আর কেউ নেই আশ-পাশে।

গেটের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়ে দুটো। একটা গাড়ির আওয়াজ শুনলো ওরা। তরতর করে ধাপ বেয়ে নিচে নামলো জনি। ভ্যানের পিছনের দরজা খুললো সে। ঘাড় ফিরিয়ে মাথা ঝাঁকালো। সলোমনের পিছু পিছু ধাপ বেয়ে নামলো রানা। উঠে পড়লো ভ্যানে। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। তালায় চাবি ঘুরলো। রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিয়ে স্টার্ট নিলো

গাড়ি। ছুটতে শুরু করে অন্ধকারের ভেতর হারিয়ে গেল।

রওনা হবার কয়েক মিনিট পর গাড়ির ভেতর একটা আলো জ্বলে উঠলো। এক কোণে কাপড়ের একটা স্তূপ দেখলো সলোমন। জুতো থেকে রেনকোট পর্যন্ত যা যা দরকার সবই আছে, প্রতিটি ওর গায়ের মাপমতো।

খুব যে একটা জোরে ছুটছে গাড়ি তা নয়, কাপড় বদলাতে কোনো অসুবিধে হলো না। মাত্র শেষ করেছে, ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়লো ভ্যান। এঞ্জিনও বন্ধ হয়ে গেল।

লাফ দিয়ে নিচে নামলো জনি। ঘুরে পিছন দিকে এসে তালা খুললো দরজার।

'কোথায় থামলাম আমরা?' কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইলো সলোমন।

'দেখার কাজটাও কি তোমাদের হয়ে আমি করবো?' মিটি-মিটি করে হাসছে জনি।

জায়গাটা বোধহয় শহরের মাঝখানে কোথাও। একটা কার পার্কে থেমেছে ভ্যান, চারদিকে আকাশ-ছোঁয়া দালান-কোঠা। 'এ কোন্ জায়গা?' আবার জিজ্ঞেস করলো সলোমন। 'ম্যানিং-হ্যাম?'

'অতো কথা জেনে দরকার নেই,' বললো জনি। 'এখানে গাড়ি বদলের জন্যে থামা হয়েছে।' একটা ট্রেঞ্চকোট, আর একটা সিল্ক স্কার্ফ রানার দিকে বাড়িয়ে দিলো সে। 'দান করার একদম পক্ষপাতি নই আমি, কিন্তু তোমার এগুলো দরকার হবে।'

হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো তার, চোখ বাদে। 'এবার কি আমি আমার পিস্তলটা ফেরত পেতে পারি, বুড়ো খোকা?'

'ইচ্ছে করলে নাও দিতে পারি,' বললো রানা। 'কাজেই এটাও আমার একটা দান বলে জেনো।' পিস্তলটা জনির হাতে ধরিয়ে দিয়ে টেঞ্চকোটটা পরতে শুরু করলো ও।

ম্যাগাজিন খুলে দেখলো জনি, তারপর ক্লিক শব্দের সাথে জায়গামতো বসিয়ে রানার দিকে চোখ তুললো। 'একটা ঝোঁক দমন করলাম, বুড়ো খোকা। বিলিভ মি।'

'জানি,' বললো রানা। 'কিন্তু এখানে আমার লাশ পড়ে থাকলে তোমার প্ল্যানের বারোটা বাজবে, এ-ও সত্যি। এখানে যারা পৌঁচেছে, এরপর তারা কোন্ দিকে যাবে, পানির মতো সহজেই বুঝে নেবে পুলিশ।'

'জানতাম এই কথাগুলোই বলবে তুমি, বুড়ো খোকা,' বললো জনি। 'ঠিক হ্যায়, আরেক সময় দেখা যাবে। এসো তাহলে সবাই।'

পার্কিং এরিয়ার শেষ মাথায়, গাঢ় ছায়ার ভেতর দাঁড়িয়ে রয়েছে গাড়িটা। একটা ভক্সহল। দেরি না করে গাড়ি ছেড়ে দিলো জনি। ম্যানিংহ্যাম থেকে বেরিয়ে যাবার রাস্তা ধরলো সে। দশ মিনিটের মধ্যে শহর ছেড়ে বেরিয়ে এলো ওরা, গ্রাম এলাকায় পড়লো গাড়ি।

রেডিও অন করলো জনি। গান বাজছে। তারপর এক সময় গান থামলো। সিটে হেলান দিলো সে। চোখ দুটো রাস্তার ওপর। 'এবার ব্যবসার কথা হতে পারে, কি বলো, মিঃ সলো-

মন ?'

'ভাবছিলাম প্রসঙ্গটা তুলতে দেরি করছো কেন।'

মৃদু শব্দে হাসলো জনি। 'মজার ব্যাপার কি জানো ? রিড কোয়েন ঠিক এই কথাটাই বলেছিল।'

ঘাড় ফেরালো সলোমন। 'রিডকেও তুমি বের করে আনো ?'

'অবশ্যই। বড় কাজগুলো আমাকে দিয়েই করান কাউন্ট।'

রানা চাইছে জন হেরিক আর রিপ হটনের কথাও জিজ্ঞেস করুক সলোমন। একই দলের লোক ওরা, সলোমনেরই জিজ্ঞেস করা সাজে।

'সে এখন কোথায় ?' জানতে চাইলো সলোমন।

'রিড কোয়েন ?' বড় করে হাসলো জনি। 'অনেক, অনেক দূরে, মিঃ সলোমন। এই একটা ব্যাপারে তোমাকে আমি পূর্ণ নিশ্চয়তা দিতে পারি—কেউ তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। আমাদের গ্যারান্টেড সার্ভিসের এটাই হলো বৈশিষ্ট্য।'

জনি থামতেই রানা জিজ্ঞেস করলো, 'বড় কাজ আর ক'টা করেছো তুমি ?'

'কেন, তা জেনে তোমার কি দরকার, বুড়ো খোকা ?'

মিটিমিটি হাসিটা রানার গা জ্বালিয়ে দিলো। 'না, এমনি জিজ্ঞেস করছি। কি রকম যোগ্য লোকের হাতে পড়েছি সেটা জানতে চাওয়া কি খুব অন্যায় ?'

'জন হেরিককেও এই বান্দা বের করে আনে,' সগর্বে বললো জনি। 'তালিকায় আরো অনেক আছে হে, শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে।'

রানার ইচ্ছেটা পূরণ করলো সলোমন। 'রিপ হটন? তাকে কে বের করে?'

কাঁধ ঝাঁকালো জনি। 'কেন জানি না, রিপ হটনকে তেমন বড় বলে মনে করেননি কাউন্ট,' বললো সে। 'তা মনে করলে তাকে বের করার দায়িত্বটাও আমাকেই দিতেন।'

'তাহলে কে বের করলো তাকে?'

'আমাদেরই কোনো লোক,' বললো জনি। 'কে, সঠিক বলতে পারবো না।'

'সে কোথায় তাও তুমি জানো না?'

'না,' বললো জনি। 'তবে সবার পরিণতিই এক রকম হয় আগে বা পরে। প্রত্যেককে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়, যেখানে তাদের কোনো দুঃখ থাকে না, ভয় থাকে না। খোশ গল্প অনেক হয়েছে, এবার কাজের কথা হোক। নগদ নারায়ণ প্রসঙ্গে কিছু বলো। তুমি আমাদের শর্ত সম্পর্কে সব জানো—বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমাদের কাজ আমরা শেষ করেছি—বের করে এনেছি তোমাকে। এবার তোমার পালা। টাকাগুলো কোথায় আছে বলো, তারপর শুরু হবে অপারেশনের দ্বিতীয় পর্ব।'

শান্তভাবে সলোমন বললো, 'নগদ কিছু নেই।'

গাড়ি দিকভ্রান্ত হলো, সামলাতে হিমশিম খেয়ে গেল জনি।

'ঠাট্টা দেখছি ভালোই জানো!'

'ঠাট্টা নয়। ডাচ হুণ্ডি ব্যবসায়ীদের সাথে আমস্টারডামে একটা চুক্তি করি আমি। আমার ভাগের বিশ লাখ পাউণ্ড দিয়ে হীরে

কিনেছি।'

'মন্দ নয়, সত্যি মন্দ নয়। পাঁচ বছরে টাকার মান কমেছে, কিন্তু হীরের দাম আরও বেড়েছে। কোথায় সেগুলো?'

'লণ্ডনে। জারমিন স্ট্রীটের একটা সেফ-ডিপোজিটে, জমা দেয়া আছে এডওয়ার্ড ব্রিজ-এর নামে। কোম্পানির বৈশিষ্ট্য হলো, একটা চাবি থাকে খদ্দেরের কাছে, আরেকটা থাকে ম্যানেজারের কাছে। বাক্সটা খোলার জন্যে দুটো চাবিই দরকার হবে তোমার।'

'তোমার চাবিটা কার কাছে?'

'আমার কেউ থাকলে তবে তো তার কাছে রাখবো,' বললো সলোমন। 'চাবিটা আমি ফেলে দিয়েছি।'

'হোয়াট!'

'ডাস্টবিনে।'

'কি!' চোখ কপালে উঠলো জনির।

সলোমন হাসছে। 'ডাস্টবিনের মতো নিরাপদ জায়গা দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি আছে? মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা রোজ সকালে এসে আবর্জনা তুলে নিয়ে যায়, কিন্তু সব আবর্জনা কি তোলে? তোলে না। ফলে মেঝেতে ময়লার একটা স্তর থেকেই যায়। আমি সেই ময়লার ওপর বসে কংক্রিটের মেঝে খুঁড়ি, চাবিটা প্লাস্টিকে জড়িয়ে মাটির নিচে পুঁতে ফেলি। ডাস্টবিনে যখন নামি আর যখন উঠি, দু'বারই কেউ আমাকে দেখেনি, কাজেই ওঠা-নামার মাঝখানের সময়টাও কেউ আমাকে দেখেনি, ঠিক?'

হাঁ করে সলোমনের দিকে তাকিয়ে আছে জনি। বিস্ময়ের ধাক্কায় হাসতে পর্যন্ত ভুলে গেছে সে।

'কখনো ডাস্টবিনের ভেতর বসেছো?' জিজ্ঞেস করলো সলোমন। 'বিশেষ করে লণ্ডনের ডাস্টবিনে? ওগুলো এতো গভীর, পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও ভেতরের সবটুকু দেখা যায় না।'

রানা অন্যমনস্ক। হাসানের কথা মন থেকে সরাতে পারছে না। রিপ হটনের ভূমিকায় অভিনয় করছিল সে। অভিনয় নিখুঁত হলেও শেষ পর্যন্ত নিজের পরিচয় গোপন রাখা তার পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব হয়নি। সলোমনকে যে প্রশ্ন করা হচ্ছে, হাসানকেও সে-প্রশ্ন করা হয়েছে। সলোমন যেভাবে উত্তর দিতে পারছে, হাসানের তা পারার কথা নয়। রিপ হটনের বিশ লাখ পাউণ্ড কোথায় আছে তা সে জানবে কিভাবে? সম্ভবত এই পর্যায়ে এসেই ধরা পড়ে যায় হাসান।

তারপর কি তাকে মেরে ফেলা হয়েছে? নাকি কাউন্টের কাছে পাঠানো হয়েছে? দ্বিতীয়টার সম্ভাবনাই বেশি। হাসানের পরিচয় জানতে চাইবে কাউন্ট। জানতে চাইবে হাসান কার প্রতিনিধিত্ব করছে। কতোটুকু কি জানে সে। তারমানে কি এখনো বেঁচে আছে হাসান?

'কোন্ ডাস্টবিনে? কোথায় সেটা?' জিজ্ঞেস করলো জনি।

'খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়,' বললো সলোমন। 'বলতে পারো একেবারে বাঘের ঘরের পাশেই। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পিছনে প্রথম যে সরু গলিটা, সেই গলির মাঝামাঝি জায়গায়। প্রতি

বছর ডাস্টবিন বদলানো হয়, কিন্তু জায়গাটা বদলায় না। খোঁজ নিয়ে দেখেছি, পঞ্চাশ বছরে একবারও বদলায়নি।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো জনি। ধীরে ধীরে পরিচিত হাসিটা এতোক্ষণে ফিরে এলো মুখে। 'তুমিই তোমার তুলনা, জো সলোমন। তোমার মতো লোককে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে সত্যি সুখ আছে। ঠিক হ্যায়, চেইনের মাধ্যমে পরবর্তী স্টেশনে তথ্যগুলো পাঠিয়ে দেবো আমি।'

'আর আমরা? আমাদের কি হবে?'

'তোমাদের দায়িত্ব নেয়ার জন্যে লোক আছে। সব কিছু যদি ঠিকঠাক মতো ঘটে, অপারেশনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু করবে ওরা। তবে তার আগে তোমার হীরে থেকে ঠিকরানো আলোর রঙ দেখতে চাইবেন আমাদের কাউন্ট। ও, হ্যাঁ, আরো একটা কথা···।'

'আবার কি কথা?'

'মিঃ নাহিদ শাহ, তার জন্যে আলাদা ফি দিতে হবে।'

হ্যাঁ-না কিছু না বলে সলোমন জিজ্ঞেস করলো, 'কাউন্টের সাথে আমাদের দেখা হবে কখন?'

'দেখা হবেই এমন কোনো কথা নেই,' বললো জনি। 'তিনি যদি চান, তাহলেই শুধু দেখা হতে পারে। দেখা হোক বা না হোক, নিরাপদ আশ্রয়ে ঠিকই তোমরা পৌঁছে যাবে। আমাদের কাজের সিস্টেম হলো, মক্কেলদের এক হাত থেকে আরেক হাতে তুলে দেয়া। সংশ্লিষ্ট সবার জন্যেই এই সিস্টেম নিরাপদ।'

'শেষ মাথায় পৌঁছে ডায়মণ্ড আর প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র পেয়ে যাবো?' জিজ্ঞেস করলো সলোমন।

'অর্ধেক ডায়মণ্ড,' বললো জনি। 'তা থেকে আবার তোমার বন্ধুর জন্যে কিছু নেবো আমরা। দেনাটা ও তোমার কাছে করুক।'

'সেজন্যে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না,' বললো রানা। 'আমার দেনা আমি কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করে দেবো।'

সামনে একটা বাঁক। বাঁ দিকে মোড় নিয়ে আরেক রাস্তায় চলে এলো ভক্সহল। এক মাইল এগিয়ে গাড়ি থামালো জনি। বৃষ্টি আগেই থেমে গেছে, মেঘেরাও উধাও হয়েছে আকাশ থেকে, পাহাড়ের মাথা থেকে উঁকি দিচ্ছে চাঁদ। চাঁদের আলোয় একটা ফার্ম হাউস দেখা গেল। কোনো প্রাণের সাড়া নেই, সম্ভবত পরিত্যক্ত।

'বুড়ো খোকারা, এবার তোমরা নামো,' বললো জনি। 'আমার দৌড় এ-পর্যন্তই।'

রানার পিছু পিছু রাস্তার পাশে ঘাসের ওপর নামলো সলোমন। চারদিকে চোখ বুলালো সে। 'এটা কি রকম হলো?' জিজ্ঞেস করলো জনিকে। 'তুমি চলে যাবে নাকি?'

হাতের ঘড়ি খুলে জানালা দিয়ে বাড়িয়ে দিলো জনি। 'এটা রাখো। এখন ন'টা পঁয়ত্রিশ। দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে আমাদের লোক এসে তোমাদের নিয়ে যাবে।'

'গাড়িটা কি হবে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'তা তো জানি না,' বললো জনি। 'সে তোমাদের জিজ্ঞেস

করবে, কোথায় যেতে চাও বলো তোমাদের আমি পৌঁছে দিই। তোমাদের বলতে হবে, ব্যাবিলন। সে বলবে, ব্যাবিলন আমার জন্যে খুব দূর হয়ে যায়, তবে পথের খানিকটা তোমাদের আমি পৌঁছে দিতে পারি। মুখস্থ করে নাও, তা না হলে ভুলে যাবে।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো সলোমন। 'তোমার মাথা ঠিক আছে তো?'

'না থাকলে তোমরা ছাড়া পেতে?' বলে গাড়ি ছেড়ে দিলো জনি। একটু পরই রাস্তার শেষ মাথায় হারিয়ে গেল ভক্সহল।

এক মিনিট বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকলো ওরা। নির্জন রাস্তা, চারদিকে কোথাও প্রাণের কোনো সাড়া-শব্দ নেই।

'চিমটি কেটে দেখবো নাকি?' নিস্তব্ধতা ভাঙলো সলোমন। 'দুঃস্বপ্ন দেখছি কিনা?'

'নিজেকে হলে কাটতে পারো।'

'না, ঠাট্টা নয়,' গম্ভীর হলো সলোমন। 'তোমার কি মনে হয়? ওরা আমাদের কাঁচকলা দেখালো?'

'মনে হয় না,' বললো রানা। 'অনেক কিছু হারাবার ভয় আছে ওদের। কাঁচকলা দেখাতে চাইলে আমাদের একটা বিহিত করতে হবে। অন্তত সেজন্যে হলেও কেউ একজন আসবে।'

'আমারও তাই মনে হয়। এসো সিগারেট ধরাই।'

গাড়ির আওয়াজ রানাই প্রথম শুনতে পেলো। রাস্তায় উঠে এসে পাহাড়গুলোর নিচের দিকে তাকালো ও, ছায়াগুলো ওখানে গাঢ়, তার ভেতর এক জোড়া হেডলাইট জ্বলছে।

'ওটাই কি?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলো সলোমন।

আরো কয়েক সেকেণ্ড দেখলো রানা, চোখ কুঁচকে সরু সরু হয়ে উঠলো ওর। তারপর মাথা নাড়লো। 'মনে হয় না। ওটা তো একটা পেট্রল ট্যাংকার আসছে।'

এগারো

বাঁক নিয়ে গ্রেট নর্থ রোডে উঠলো ভক্সহল। রাস্তার পাশে প্রথম যে কাফেটা দেখলো তার সামনে থামলো জনি। সরাসরি ফোন বক্সে ঢুকলো সে।

দু'জায়গায় ফোন করলো জনি। প্রথমটা অনেক দূরে, ম্যানুয়্যাল এক্সচেঞ্জ বলে লাইন পেতে বেশ একটু দেরি হলো। প্রায় পাঁচ মিনিট পর ভোঁতা একটা ওর্কশায়ার কণ্ঠস্বর শুনলো সে, বাধা দিয়ে বললো, 'তুমি হোফার টুইড। শোনো, প্রোগ্রামে একটু গোলমাল হয়েছে। তুমি একটা প্যাকেট পাবে বলে আশা করছো, কিন্তু তোমাকে নিতে হবে দুটো।'

'দুটো?'

'হ্যাঁ,' বললো জনি। 'ভেবে দেখো নিতে পারবে কিনা। না পারলে আমাকে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। নিলে তুমি অবশ্য ফি বেশি পাবে—ডাবল।'

খ্যাক খ্যাক করে হাসলো হোফার টুইড। এমন সুরে কথা বললো সে যেন গরু-ছাগল দর করছে। 'আসলে হওয়া উচিত ডবলের কিছু বেশি, তাই না? প্রস্তাবটা হঠাৎ করে পেলাম তো, প্রস্তুতির ব্যাপার আছে, টেনশনের কথা নাহয় বাদই দিলাম।' এক সেকেণ্ড বিরতি নিলো সে, জনি হ্যাঁ-না কিছু বলছে না দেখে তাড়াতাড়ি শুরু করলো আবার, 'ঠিক আছে, রাজি। ডবলেই আমি সন্তুষ্ট।'

'আমি জানতে চেয়েছি, কাজটা তুমি করতে পারবে কিনা।'

'কেন পারবো না? সময় একটু বেশি লাগবে এই যা। আর একটু সাবধান থাকতে হবে। এতো দিন ধরে একই কাজ করছি, পারবো না মানে?'

'গুড।'

'ও, ভুলেই গেছি,' বললো হোফার টুইড, 'আমার স্ত্রী যে স্কেরসিক সে তো আপনাকে আমি আগেই বলেছি, তাই না?'

'হ্যাঁ। কেন, কি হয়েছে?'

'কি আবার হবে!' ত্যক্ত কণ্ঠে বললো টুইড, 'কাল রাতে মারা গেছে। আর সময় পেলো না।'

'শুনে দুঃখ পেলাম।'

'কি বললেন?'

'দুঃখ পেলাম শুনে।'

'আপনার রাগ হচ্ছে না ?'

উত্তর না দিয়ে জনি জিজ্ঞেস করলো, 'লাশটা কোথায় ?'

'বাড়িতেই। কাল সকালে ব্যবস্থা হবে।'

'আর কাজটা ?'

'চেষ্টা করবো রাতেই যাতে সারতে পারি।'

'ঠিক আছে,' বললো জনি। 'খবর নেবো আমি।' রিসিভার নামিয়ে রাখলো সে। তারপর পকেট থেকে খুচরো পয়সা বের করে আবার ক্রেডল তুললো, এবার ডায়াল করলো লণ্ডনের নম্বরে।

প্রায় সাথে সাথে অপরপ্রান্ত থেকে একটা মার্জিত মেয়েলি কণ্ঠ ভেসে এলো, 'ইউনিভার্সেল এক্সপোর্ট।'

'হ্যালো, সুইটি, কাউন্টি ডারহাম থেকে রবার্ট পিয়ারসন আমি তোমার নাগর বলছি।'

'অসভ্যতা করার আরো অনেক সময় পাবে। কি ঘটেছে তাই বলো। এইমাত্র টিভির খবর শুনলাম। দুটো প্যাকেট, একটা নয়—ব্যাপারটা কি ?'

'সত্যি কিছু করার ছিলো না। দু'নম্বর প্যাকেটটার ব্যাপারে আমি সন্তুষ্ট নই। কেমন যেন গোলমেলে। তবু, কিছু এসে যায় না। দুটোই নেবে বলে রাজি হয়েছে টুইড। দ্বিগুণ টাকা দিতে হবে।'

'খবরটা তাহলে জায়গামতো জানাতে হয় আমাকে। নারায়ণ কোথায় আছে ?'

'নেই, আছে আরো অনেক ভালো জিনিস। হীরে। জারমিন

স্ট্রীটের একটা সেফ ডিপোজিটে, এডওয়ার্ড ব্রিজের নামে।'

'চাবি?'

'হেসো না,' বললো জনি। 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পিছনে প্রথম যে গলিটা পড়বে, তার মাঝামাঝি জায়গায় একটা ডাস্টবিন আছে...'

'আছে,' অপরপ্রান্ত থেকে বললো মেয়েটা। 'ওদিকেই থাকি আমি।' তারপরই বিস্ময়সূচক একটা আওয়াজ করলো সে। 'কি বললে? ডাস্টবিন?'

'হাসতে বারণ করেছি, তারমানে তোমাকে আমি কাঁদতেও বারণ করেছি। হ্যাঁ, ডাস্টবিন। সকালে মিউনিসিপ্যালিটির লোক আবর্জনা নিয়ে চলে যাবার পর লণ্ডন ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের একটা গাড়ি নিয়ে আমাদের লোক হাজির হবে ওখানে। সঠিক লোকের সাথে যোগাযোগ করতে পারলে গাড়ি যোগাড় করা কোনো সমস্যা হবে না...।'

'সে ব্যবস্থা কিভাবে করতে হয় আমার জানা আছে, ওখানে গিয়ে কি করতে হবে তাই বলো।'

'ডাস্টবিনটার মেঝে নষ্ট হয়ে গেছে,' বললো জনি। 'তোমার লোকেরা সিমেণ্ট, বালি, ইত্যাদি নিয়ে যাবে মেরামত করার জন্যে। মেরামতের আগে অবশ্য মেঝেটা খুঁড়তে হবে। প্লাস্টিকের ব্যাগ, ভেতরে সোনার কাঠি।'

'ফর গডস সেক!'

'ফর গডস সেক।'

'এখুনি আমি সব ব্যবস্থা করে রাখছি, কাল সকালে যাতে

কাজটা উদ্ধার হয়। আর, রবার্ট···।'

'ইয়েস, সুইটি?'

'তোমার জায়গায় আমি হলে সকালে আমার প্রথম কাজ হতো হোফার টুইডের খবর নেয়া···।'

'ঠিক আমি যা ভাবছিলাম। রাখি তাহলে, কেমন? কোথাও নিশ্চয়ই একদিন দেখা হবে তোমার সাথে, কি বলো?'

গাড়িতে ফিরে আসার সময় অকারণ হাসিটা জনির সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো।

ট্যাংকারের গোপন কমপার্টমেন্ট থেকে উঠে এসে রানা দেখলো আকাশ জুড়ে তারার মেলা বসেছে। তবে আশপাশটা কেমন ভেজা ভেজা, আর কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, বেশিক্ষণ হয়নি জোরালো খানিকটা বৃষ্টি হয়ে গেছে। রানার পিছু পিছু সলোমনও বেরিয়ে এলো। হ্যাচের ঢাকনি বন্ধ করে দিয়ে ওপর থেকে ওদের দিকে তাকালো ড্রাইভার। এই লোকটা জনির ঠিক উল্টো, একদম হাসতে জানে না। 'রাস্তা টপকে ঢাল বেয়ে নেমে যান,' বললো সে। 'খানিকদূর গেলে একটা মেটো পথ পাবেন। ছুয়েক গজ এগিয়ে অপেক্ষা করতে থাকুন, কেউ না কেউ আসবে। গুড লাক।'

ক্যাবে ঢুকলো লোকটা। ব্রেক রিলিজ করায় জোরালো হিস্‌স্‌ শব্দ হলো। ঘড় ঘড় আওয়াজ তুলে অন্ধকারে হারিয়ে গেল ট্যাংকার।

তারার আলোয় যতোদূর দেখা যায়, চোখ বুলিয়ে নিয়ে

রানার দিকে ফিরলো সলোমন। 'ভালো লোকদের পাল্লায় পড়া গেছে, তাই না?'

'ক'টা বাজে?' জিজ্ঞেস করলো রানা। হাত-পায়ের আড়ষ্টতা দূর করার জন্যে জগিং শুরু করলো ও।

হাতঘড়ি দেখলো সলোমন। 'দেড়টার কাছাকাছি।'

'তারমানে ট্যাংকারের ভেতর প্রায় চার ঘণ্টা ছিলাম আমরা। ধরো, দেড়শো মাইল পেরিয়ে এসেছি। চলো দেখি, জায়গা মতো গিয়ে দাঁড়াই।'

হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগোলো সলোমন, অনেকটা নাচের ভঙ্গিতে। 'আবার কেউ আমাকে ট্যাংকারের ভেতর ঢুকতে বললে আমি পালাবো।'

রাস্তা পেরিয়ে ঢাল বেয়ে নামলো ওরা। পাথর আর মাটি মেশানো ঢাল, পিছলা। নেমে আসতে প্রচুর সময় লাগলো। মেটো পথটা বেশ চওড়া। শ দুয়েক গজ এগিয়ে ওরা থামলো।

'কই, কাউকেই তো দেখছি না।'

'এখনো কেউ আসেনি,' বললো রানা।

দূরে কোথাও একটা কুকুর কাঁপা গলায় ডেকে উঠলো। তারা জ্বলা আকাশের নিচের দিকে উঁচু-নিচু কালো রেখা, পাহাড়শ্রেণী। ডানা ঝাপটে রাত জাগা পাখি উড়ে গেল একটা।

'শালার কোন্ জায়গায় এসে পড়লাম বলো তো!' অস্বস্তি-বোধ করছে সলোমন। চারদিক একেবারে নির্জন।

পথের আরেক দিক থেকে ছোট্ট একটা শব্দ এলো, যেন একটা নুড়ি পাথর খানিকটা নেমে এলো গড়িয়ে। দু'জনেই

তাকালো সেদিকে। গাঢ় ছায়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা মেয়ে। 'কোথাও যেতে চাইলে বলো তোমাদের আমি পৌঁছে দিই।'

সাথে সাথে মেয়েটার গলার আওয়াজ চিনতে পারলো রানা, ফিসফিস করে সলোমনকে বললো, 'কোনো সন্দেহ নেই ওর্ক-শায়ারের কোনো একটা অংশ।'

স্কার্ফ পরেছে মেয়েটা, গায়ে পুরানো একটা রেনকোট। ওদের কাছ থেকে তিন হাত দূরে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে সে। চাঁদের সাদা আলোয় তার মুখটা ভালো করে দেখা গেল না, কিন্তু রেনকোট ঠেলে ফুটে রয়েছে উথলানো যৌবনের রেখা-গুলো।

সলোমনের ঢোক গেলার আওয়াজ, রানার মনে হলো, বিশ গজ দূর থেকেও শোনা গেল। 'ব্যবিলন।'

'ব্যবিলন আমার জন্যে খুব দূর হয়ে যায়, তবে পথের খানিকটা তোমাদের আমি এগিয়ে দিতে পারি।' মিষ্টি গলা মেয়েটার, কিন্তু নিস্তেজ আর বিষণ্ন। রানার মনে হলো, মেয়েটা বারবার দীর্ঘশ্বাস চাপছে।

ঘুরে দাঁড়ালো মেয়েটা, যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে এগোলো। নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করলো ওরা।

'আমাকে একটা চিমটি কাটবে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো সলোমন। 'তাহলেই যদি বিশ্বাস হয় স্বপ্ন দেখছি না।'

হেসে ফেললো রানা। 'ভুল লোককে ধরছো তুমি। তোমার আসলে মেয়েটাকে অনুরোধ করা উচিত।'

'চিমটি নয়, ওর কাছ থেকে আমি অন্যকিছু চাইবো,' বলে

[illegible]

[illegible]

তার পাশে, অন্ধকারে, কি যেন নড়ে উঠলো। উদ্বেজনায় সামনের দিকে ঝুঁকলো শরীরটা আকাশের তুফান, তার ঠোঁটের কোণ থেকে ঘুমের মতো লালা ঝরছে।

'এবার তোমাকে দুটো নারকেল ভাঙতে হবে, তুফান,' বললো হুইড। 'ঘাবড়াবার কিছু নেই, আমিও থাকবো তোমার সাথে। তবে আগে ধীরে, তাড়াহুড়ো করা ঠিক হবে না। সময় হলে তোমাকে আমি বলবো।'

তুফানের পিঠ চাপড়ে দিয়ে সই বেয়ে নামলো সে। খোলা থেকে বেরিয়ে এসে দেখলো, গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকছে মেয়েটা, মামা আর সলোমন তার ঠিক পিছনেই রয়েছে।

'মা, মাগো,' বলে প্রায় ঝুঁপিয়ে উঠলো হোফার হুইড। ভাবাবেগে অধীর হয়ে, অনেকটা মাতালের মতো টলতে টলতে ছুটে গিয়ে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরলো সে। 'তুমি আমার লক্ষ্মী মেয়ে, রোজেনা। আজকের দিনেও তোমাকে কতো কষ্ট করতে হলো।' রোজেনা নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো আস্তে করে। কপালের চুল সরিয়ে আড়চোখে তাকালো সলোমনের দিকে। একটু

আড়ষ্ট, বোধহয় লজ্জা পেয়েছে। 'আর একটা কাজ, মা, তারপর তোমার ছুটি,' বলে চলেছে টুইড। 'মুরগির রোস্ট আর ডিমের ওমলেট করো, মেহমানদের খেতে দিতে হবে।'

একটাও কথা না বলে উঠন থেকে ঘরের দিকে চলে গেল রোয়েনা। ওদের দিকে ফিরে এক গাল হাসলো টুইড, কেউ বলবে না এই লোকই এক মুহূর্ত আগে ফোঁপাচ্ছিল। 'মিঃ জো সলোমন এবং মিঃ নাহিদ শাহ—কংগ্রাচুলেশন্স! এগারোটার খবরে আপনাদের সম্পর্কে এতো কিছু বলা হয়েছে, মনে হচ্ছে আপনাদের আমি বিশ বছর ধরে চিনি। হোফার টুইড অ্যাট ইওর সার্ভিস, জেন্টলমেন!'

'নাটুকে, বিপজ্জনক চরিত্র,' বিড়বিড় করে বললো রানা।

টুইডের বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরলো না সলোমন। 'ওটা কি?' গোলাঘরের ছায়া থেকে হঠাৎ ডুগানকে বেরিয়ে আসতে দেখে সতর্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করলো সে।

'ডুগান, মিঃ সলোমন, আমাদের গুড বয় ডুগান।' অর্থবহ ভঙ্গিতে নিজের কপালে একটা টোকা মারলো টুইড। 'ওপর-তলায় যা যা থাকা দরকার বেশিরভাগই নেই ওর। তবে ফার্মে, দু'জনের কাজ একাই করতে পারে। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে কি করছি আমরা? আসুন, ঘরে দিয়ে আসি আপনাদের। হাত-মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হোন, রোয়েনা ইতিমধ্যে টেবিল সাজিয়ে ফেলবে।'

'রোয়েনা—তোমার মেয়ে?' পোর্চে উঠে এসে জিজ্ঞেস করলো সলোমন।

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বললো টুইড। 'বড় লক্ষ্মী মেয়ে, বুঝলেন।'

'কথা খুব কম বলে, তাই না?'

'আরে, ঠিক ধরেছেন তো!' হঠাৎ হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে শুকনো চোখ মুছলো টুইড। কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, 'আজ তো এমনিতেই ওর পক্ষে কথা বলা সম্ভব নয়। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে ওর মা মারা গেছে।' বাঁ দিকে একটা দরজা, আস্তে করে ঠেলা দিয়ে সেটা খুললো সে। লম্বা টেবিলে একটা কফিন দেখা গেল। 'সকাল দশটায় ওকে আমরা গ্রামের চার্চে নিয়ে যাবো। আট মাইল পথ, ন'টার মধ্যে লাশ নেয়ার জন্যে পৌঁছে যাবে গাড়ি। ততোক্ষণ আপনারা একটু মাথা নিচু করে থাকবেন আর কি।'

দরজা বন্ধ করে পথ দেখালো সে, কাঠের সরু সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠে এলো ওরা। লম্বা ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছে শেষ মাথার একটা দরজা খুললো টুইড। ভেতরে ঢুকে আলো জ্বাললো। 'আপনাদের রাতের কবরখানা।'

রানা আর সলোমন পরস্পরের দিকে তাকালো।

ভেতরে ঢুকলো ওরা। একটাই বিছানা, তবে বড়সড়। ছোটো একটা ওঅর্ডরোব, ছোটো একটা ড্রেসিং টেবিল, আর মার্বেল পাথরের একটা ওয়াশবেসিন রয়েছে, সবই বহু-ব্যবহারে মলিন।

'গরীবের ডেরায় উঠেছেন, একটু কষ্ট করতে হবে,' সবিনয়ে বললো টুইড। 'আলাদা বিছানার ব্যবস্থা করতে পারিনি।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। 'একা হয়ে গেছি, বুঝতেই তো পারছেন, খাতির যত্ন তেমন করতে পারবো না।'

রেনকোটের বোতাম খুলে সেটা বিছানার দিকে ছুঁড়ে দিলো

সলোমন। 'এখানে আমরা ক'দিন থাকছি ?'

'এখুনি বলি কি করে। আমাকে টেলিফোন করা হবে। আগামীকাল সম্ভবত। খুব দেরি হলে পরশু। তবে উদ্বিগ্ন হবেন না। এখানে আপনারা সম্পূর্ণ নিরাপদ। যে-কোনো জায়গা থেকে শত মাইল দূরে রয়েছেন।'

'কোথায় ?' প্রশ্ন করলো রানা।

'উত্তর দিলে তথ্য ফাঁস করা হবে, তাই না, মিঃ নাহিদ শাহ্?' ঠোঁট সরু করে হাসলো টুইড। 'যার নেমক খাই তার সাথে বেঈমানী করা আমার স্বভাব নয়, প্লিজ। তাছাড়া, নিজের প্রোটেকশনের কথাও আমাকে ভাবতে হয়। তৈরি হয়ে নিন, তারপর নেমে আসুন নিচে।'

টুইডের পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। জ্যাকেট খুলে বিছানার দিকে ছুঁড়ে দিলো সলোমন। 'কি মনে হলো তোমার ?'

'চোখের আড়ালে এ লোককে বিশ্বাস করি না।' জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকালো রানা। 'বাড়িটার চারদিকে আমি শুধু অশুভ ছায়া দেখতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছো, বাতাস কেমন গোঙাচ্ছে ?'

ভুরু কুঁচকে তাকালো সলোমন। 'তোমার আবার ভূতের ভয় আছে নাকি ?'

'উঁহুঁ, কারণ আমি ভূত ছাড়াতে জানি।'

ওয়াশবেসিনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সলোমন। জগ থেকে পানি নিয়ে চোখে-মুখে ছিটালো সে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললো, 'খাবো কি, ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে।'

'তোমার বুঝি ধারণা, টুইড তোমাকে ঘুমাতে দেবে?'

ঝট্ করে রানার দিকে ফিরলো সলোমন। 'তারমানে?'

কাঁধ ঝাঁকালো রানা, কিন্তু কিছু বললো না।

'একটু বেচাল চলতে দেখি, শালার আমি ঘাড় মটকাবো,' ফুঁসে উঠে বললো সলোমন।

ট্রেঞ্চকোট খুলে বেসিনের দিকে এগোলো রানা। 'তার আগে নিজের ঘাড়টা বাঁচাতে হবে তোমার। নাকি ডুগানের কথা এরই মধ্যে ভুলে গেছো?'

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো সলোমন। 'আমার ধারণা ওটা একটা জড়-পদার্থ। বুদ্ধি-সুদ্ধি বলতে কিছুই নেই।'

'তারমানে টুইডের বুদ্ধিতে চলে সে।'

'এবং টুইড লোক ভালো নয়।'

রানা হাসলো। 'ঠিক তাই।'

'কিন্তু এসবই আমাদের আন্দাজ,' বললো সলোমন। 'সত্যি নাও হতে পারে।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'নিচে আছি, তুমি এসো,' বললো সলোমন। 'দেখি টুইড ব্যাটা কি করছে।'

চলে গেল সলোমন। বেসিনের ওপর চিড় ধরা আয়নার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলো রানা। কোনো কারণ নেই অথচ মন বলছে এটা সত্যি একটা অশুভ বাড়ি। মনকে ইঙ্কন যুগিয়েছে মেয়েটার মৌনতা, টুইডের আড়চোখে তাকানোর স্বভাব, এবং ডুগান নামে তার কালো ছায়া।

কিন্তু উদ্দেশ্য যদি খারাপ হয়, কি হতে পারে সেটা ? টুইড বোকা নয়, বুঝে নিয়েছে ওদের দু'জনকে কাবু করা সহজ হবে না। অবশ্য একজন একজন করে, আলাদাভাবে···। ছ্যাঁৎ করে উঠলো রানার বুক। 'সর্বনাশ!' বিড়বিড় করে উঠলো ও। তোয়ালেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দরজার দিকে ছুটলো। হ্যাঁচকা টানে কবাট খুলে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো সিঁড়িতে।

নিচের বসবার ঘরে নেমে এসে কাউকে দেখলো না সলোমন। ঘরে আলো জ্বলছে, কিন্তু চারটে কোণ আর সিলিং সহ এখানে সেখানে এতো বেশি ছায়া যে গা ছমছম করে উঠলো তার। বাড়িটায় পা দিয়েই লক্ষ্য করেছে সে, প্রতিটি বালব কম ওয়াটের, ছায়াগুলোকে বেশি দূর তাড়াতে পারে না। কোথাও কোনো শব্দ না পেয়ে গায়ের লোম খাড়া হতে শুরু করলো সলোমনের। ওদের দু'জনকে রেখে বাড়ি ছেড়ে পালায়নি তো সবাই ? তাড়াতাড়ি অন্ধকার প্যাসেজে বেরিয়ে এলো সে।

ফাঁকা প্যাসেজ। রান্নাঘরের দরজা খোলা রয়েছে, কিন্তু ভেতরে কেউ আছে কিনা বোঝা গেল না। সাবধানে এগোলো সলোমন। আশ্চর্য, রান্নাঘরেও কোনো আলো জ্বলছে না। লালচে আলোটা সম্ভবত আগুনের আভা।

দরজার কাছ থেকে উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকালো সলোমন। ভয় পেয়েছিল বলে মনে মনে তিরস্কার করলো নিজেকে। জ্বলন্ত চুলোর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রোয়েনা। পুরনো একটা সুতী ড্রেস পরেছে সে, অনেক দিন ধরেই গায়ে একটু ছোটো হয় বলে

এখানে সেখানে সেলাই কেটে গেছে। সলোমন লক্ষ্য করলো, মেয়েটার পায়ে মোজা নেই। চাঁদের আলোয় ব্যাপারটা বোঝা যায়নি, উপলব্ধি করে খানিকটা হতাশ হলো সে—দেখতে মোটেও মেয়েটা ভালো নয়। মুখের হাড় দুটো অস্বাভাবিক উঁচু, নাকটার কোনো ছিরি-ছাঁদ নেই, বেঢপ কপাল। অনেকেই তাকে কুৎসিত বলতে দ্বিধা করবে না।

তবে হ্যাঁ, শরীর বটে একখানা। যৌবনের যেন বান ডেকেছে। সলোমনের ধারণা হলো, এ মেয়ে ঘুমাতে পারে না, বিছানায় ছটফট করে রাত কাটায়।

'রান্না প্রায় হয়ে এসেছে,' বিষণ্ণ, নিস্তেজ গলায় বললো রোয়েনা। হাত দুটো সুগোল উরুর ওপর ঘষলো, কুঁচকে থাকা কাপড় সমান করার ব্যর্থ চেষ্টা। 'উঠেছি শেডে যাবো বলে, চুলোর জন্যে আরো কিছু কাঠ লাগবে।'

সিঙ্কের ওপর সার সার কয়েকটা হুক, তার একটা থেকে ল্যাম্পটা নামালো রোয়েনা। ল্যাম্প জ্বেলে পিছনের দরজার দিকে পা বাড়ালো সে। তার আগেই দরজার সামনে পৌঁছে গেল সলোমন। 'দাও, আমাকে দাও,' বলে রোয়েনার হাত থেকে ল্যাম্পটা একরকম কেড়ে নিলো সে। 'তোমার সাহায্য দরকার।'

ইতস্তত করলো রোয়েনা, সলোমনের মুখের দিকে ভালো করে তাকালো, চেহারায় অনিশ্চিত একটা ভাব। তারপর, যেন লজ্জা পেয়েছে, ধীরে ধীরে মাথা নিচু করলো। বিড়বিড় করে বললো, 'বেশ, চলুন। শেডটা উঠানের ওদিকে।'

উঠনে কোথাও মসৃণ পাথর, কোথাও মাটি। বারবার পা পিছলে যাবার উপক্রম হলো সলোমনের। একবার একটা গর্তে পা পড়লো, পানি ঢুকলো জুতোর ভেতর।

শেডের দরজা খুললো রোয়েনা। পচা খড়, আর ভ্যাপসা একটা গন্ধ ঢুকলো সলোমনের নাকে। একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা, তার পাশ ঘেঁষে ভেতরে ঢুকলো সে। ছাদের কয়েক জায়গায় গর্ত, ঝলমলে তারা দেখা গেল আকাশে।

'এদিকে,' বললো রোয়েনা।

মেয়েটার দিকে এগোলো সলোমন, ল্যাম্প ধরা হাতটা উঁচু করলো। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো সে। ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রোয়েনা। আলোর শিখা কাঁপছে, কখনো আলো কখনো ছায়া পড়ছে মেয়েটার মুখে। রাস্তায় চাঁদের আলোয় প্রথমবার দেখে যেমন মনে হয়েছিল, আদি এবং অকৃত্রিম নগ্ন ইভ বলে মনে হলো রোয়েনাকে।

ঘুরলো মেয়েটা, পিছন ফিরে ঝুঁকে পড়লো স্তূপ করা চেলা কাঠের দিকে। তার উরুর পিছন দিকে আর নিতম্বে দ্বিতীয় চামড়ার মতো সেঁটে গেল সুতী কাপড়।

পাঁচ বছর! ভাবলো সলোমন। একটানা পাঁচ বছর কোনো মেয়ের স্পর্শ পাইনি! নিঃশব্দে সামনে এগোলো সে, শিকারী বিড়ালের মতো। চোখ দুটো বিস্ফারিত, মুখ হাঁ করে আছে। হাত বাড়িয়ে ছুঁতে যাবে, হঠাৎ সিধে হয়ে ঘুরলো রোয়েনা। থমকে গেল সে, আকস্মিক বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেছে।

শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ। কেউ নড়লো না।

তারপর যেন টলে উঠলো রোয়েনা। যেন সলোমনের দিকে ঝুঁকছে সে।

বাড়ির কোথাও থেকে হাঁক ছাড়লো রানা, 'সলোমন? এই সলোমন!'

ঠোঁট লম্বা করে হাসলো সলোমন। একটা হাত বাড়িয়ে আলতোভাবে মেয়েটার গাল স্পর্শ করলো সে। 'তুমি খুব ভালো মেয়ে, রোয়েনা। অন্য কোনো সময়, কেমন? ল্যাম্পটা তুমি ধরো, আমি কাঠ নিচ্ছি।'

ল্যাম্পটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে পিছিয়ে গেল রোয়েনা। আঙুলের ডগাগুলো সাদা হয়ে গেছে। একটা হাতের ভাঁজে দশ-বারোটা চেলা কাঠ নিয়ে সিধে হলো সলোমন, আগে আগে বেরিয়ে এলো শেড থেকে। উঠনের অর্ধেকটা পেরিয়ে এসেছে, রান্নাঘরের দরজায় রানাকে দেখা গেল। 'ও, তুমি তাহলে একটা কাজে ছিলে,' বললো রানা। 'কাউকে দেখতে না পেয়ে···এই মেয়ে, তোমার বাবা কোথায় জানো?'

'এই তো, আমি এখানে, মিঃ নাহিদ শাহ।' অন্ধকার উঠনের খানিক ওপাশ থেকে বেরিয়ে এলো হোফার টুইড। 'ছাগল আর ভেড়াগুলোকে ঘরে ঢোকালাম।'

'ডুগান কোথায়?'

হে হে করে হাসলো টুইড। 'ওটাকে কোনো গুরুত্বই দেবেন না।'

সলোমন ঝাঁঝের সাথে বললো, 'নাহিদ জানতে চাইছে, কোথায় সে?'

চোখ পিট পিট করে একবার সলোমন, একবার রানার দিকে তাকালো টুইড। 'বুঝলাম না, স্যার। আমরা কেউ কোনো অন্যায় করেছি?'

'প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছো কেন?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ডুগান?' অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো টুইড। 'ওটা আবার একটা মানুষ নাকি যে কোথায় গেল না গেল খোঁজ নিতে হবে! কখনো ছাগলের সাথে শোয়, কখনো মুরগীর খাঁচায় ঘুমায়। আজ অবশ্য ওকে আমি গোলাঘরে শুতে বলেছি। বলে দিয়েছি, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া মেহমানদের সামনে যেন না আসে।'

'কেন?'

চেহারায় রাজ্যের বিস্ময় ফুটিয়ে টুইড বললো, 'দেখেননি, ওর মুখ থেকে সব সময় লালা ঝরে?'

রান্নাঘরের দিকে এগোলো সলোমন, বিড়বিড় করে কি বললো বোঝা গেল না। এগিয়ে এসে মেয়েটার সামনে দাঁড়ালো টুইড। 'কি রান্না করেছো, মা-মণি? মেহমানদের কথা কি বলবো, আমারই এমন খিদে পেয়েছে, আস্ত একটা ঘোড়া খেয়ে ফেলতে পারি।'

টুইডকে পাশ কাটিয়ে সলোমনের পিছু পিছু হন হন করে এগোলো রোয়েনা। তার আচরণে তাচ্ছিল্যের ভাবটুকু রানার দৃষ্টি এড়ালো না।

আরো প্রায় এক ঘণ্টা পর গোলাঘর থেকে অন্ধকার উঠনে বেরিয়ে এলো প্রকাণ্ড একটা ছায়ামূর্তি। দূর পাহাড়ের কোথাও

থেকে একটা শিয়াল ডেকে উঠলো। উঠন পেরোতে গিয়ে থম-কালো ডুগান, বুকে ক্রস চিহ্ন আঁকলো—কাজে আজ বাধা পড়বে, শিয়ালের ডাক অশুভ লক্ষণ। কাঁধ ঝাড়া দিয়ে খুঁতখুঁতে ভাবটা সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করলো সে, পিছনের দরজার দিকে এগোলো।

রান্নাঘরে একটা টেবিলের সামনে বসে পাইপ টানছে হোফার টুইড। উত্তেজনায় ঘন ঘন পা দোলাচ্ছে সে, চোখের সামনে মেলে ধরেছে একটা খবরের কাগজ। মুখ তুলে ডুগানকে ঢুকতে দেখলো, বললো, 'এসেছো তাহলে। আমি ভাবছিলাম আবার না ডাকতে যেতে হয়।'

ভোঁতা, কর্কশ, ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ বেরুলো ডুগানের গলা থেকে, 'আমার হাত নিশপিশ করছে।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালো টুইড। ডুগানের পিঠ চাপড়ে দিলো। 'তুমি না থাকলে কি যে করতাম আমি।' লম্বা পা ফেলে কাবার্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে, কবাট খুলে ভেতর থেকে দশ পাউণ্ড ওজনের একটা হাতুড়ি বের করলো। এগিয়ে এসে সেটা বাড়িয়ে দিলো ডুগানের দিকে। 'কি করতে হবে জানো তো?'

হাতুড়িটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিলো ডুগান। চোখে পলক পড়লো না, অস্বাভাবিক চকচক করছে। মোটা সুতোর মতো লালা ঝরছে মুখ থেকে। গলা থেকে দুর্বোধ্য একটা উল্লাস-ধ্বনি বেরিয়ে এলো।

'লক্ষ্মী ছেলে। চলো যাওয়া যাক। শুভ কাজে দেরি করতে নেই।'

দ্বিতীয় দরজাটা খুললো টুইড, পথ দেখিয়ে প্যাসেজ ধরে এগোলো। খুব সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে উঠলো ওরা, প্রায় কোনো শব্দই হলো না। ল্যাণ্ডিংঙে পৌঁছে একটু বিশ্রাম নিলো টুইড, উত্তেজনায় হাঁপিয়ে উঠেছে। তারপর শেষ মাথার দরজার সামনে দাঁড়ালো সে, ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে ডুগানকে কোনো শব্দ করতে নিষেধ করলো। আস্তে করে নবটা ধরলো সে, ধীরে ধীরে ঘোরালো।

নব ঘুরলো না।

ডুগানকে ল্যাণ্ডিঙের আরেক দিকে ঠেলে নিয়ে গেল টুইড। পিছিয়ে গেল ডুগান, কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে নামতে রাজি নয় সে। অগত্যা বারবার তাকে ঠেলা দিতে হলো। সিঁড়ির একেবারে নিচে নেমে এসে ফিসফিস করে বললো টুইড, 'তোমাকে তো আগেই বলেছি, তাড়াহুড়ো করলে অসুবিধে আছে। অন্তত এই কাজটায়। মন খারাপ করো না, কথা দিচ্ছি কাল তুমি সুযোগ পাবে।'

বেডরুমের মাঝখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে রানা আর সলোমন। দু'জনেই স্থির চোখে তাকিয়ে আছে দরজার নবের দিকে। নবটা নড়লো, কিন্তু ঘুরলো না। মৃদু পায়ের আওয়াজ দরজার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, এই সময় হিশ্‌শ্‌ করে লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সলোমন।

'তুমি পাশে থাকায় আমি কৃতজ্ঞ, নাহিদ!' চাপা স্বরে বললো সে। 'মাই গড! নিজেকে আমার দুগ্ধপোষ্য শিশু মনে

হচ্ছে। মনে হচ্ছে বাড়িটার আনাচেকানাচে গলায় খুলির মালা ঝুলিয়ে নাচানাচি করছে ভূতেরা। ভাগ্যিস তুমি জেগে থাকতে বলেছিলে!'

'আমি ওদের তিনজনের কথা ভাবছি,' বললো রানা। 'জন হেরিক, রিড কোয়েন, আর রিপ হটন। ওদের কপালে কি ঘটেছে জানা গেলে বুঝতে পারতাম আমাদের সামনে কি আছে।'

'চলো, জেনে আসি।' দরজার দিকে পা বাড়ালো সলোমন।

খপ করে তার একটা হাত ধরে ফেললো রানা, 'কি করছো!'

'বানচোতটার মুখে পেচ্ছাব করবো,' ফুঁসে উঠলো সলোমন। 'তারপর পেটের ওপর পা দিয়ে দাঁড়ালেই গড়গড় করে সব বলে দেবে।'

'ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো,' বললো রানা। 'ওদের উদ্দেশ্য কি, এখনো আমরা তা জানি না। হয়তো খারাপ, কিন্তু কতোটুকু খারাপ বলা কঠিন। এমনও তো হতে পারে আমাদের কোনো অসুবিধে হচ্ছে কিনা দেখতে এসেছিল।' বললো বটে, কিন্তু রানা নিজেই কথাটা বিশ্বাস করে না।

এক সেকেণ্ড চিন্তা করলো সলোমন। 'হয়তো তাই। কিন্তু গিয়ে জিজ্ঞেস করতে দোষ কি? হাবভাব দেখে বুঝতে পারবো মিথ্যে কথা বলছে কিনা।'

'তা বুঝেও কোনো লাভ হবে না,' বললো রানা। 'তাতে শুধু ওদেরকে সতর্ক করে দেয়া হবে। বুঝতে পারছো না কেন, কাউণ্টের সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম টুইড।'

'এখন গিয়ে যদি শালার একটা হাত ভাঙি, কাউণ্টের ঠিকানা

জানতে পারবো না ?'

হাসলো রানা। 'তোমার বুঝি ধারণা টুইডের মতো লোক কাউন্টের ঠিকানা জানে ?'

মিইয়ে গেল সলোমন। 'তাহলে আমাদের এখন করণীয় কি ?'

'অপেক্ষা করা,' বললো রানা। 'চাল যা দেয়ার টুইডই দিক। আমরা তো সতর্কই আছি, দেখা যাক না কি করে সে।'

'রাতটা তাহলে···?'

'আর বোধহয় আসবে না ওরা,' বললো রানা। 'কিন্তু ঝুঁকি নেয়ারও কোনো মানে হয় না। ঘুমালে একজন।'

বিছানায় উঠে শুয়ে পড়লো সলোমন। 'দু'ঘণ্টা পর তুলে দিয়ো আমাকে।'

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)